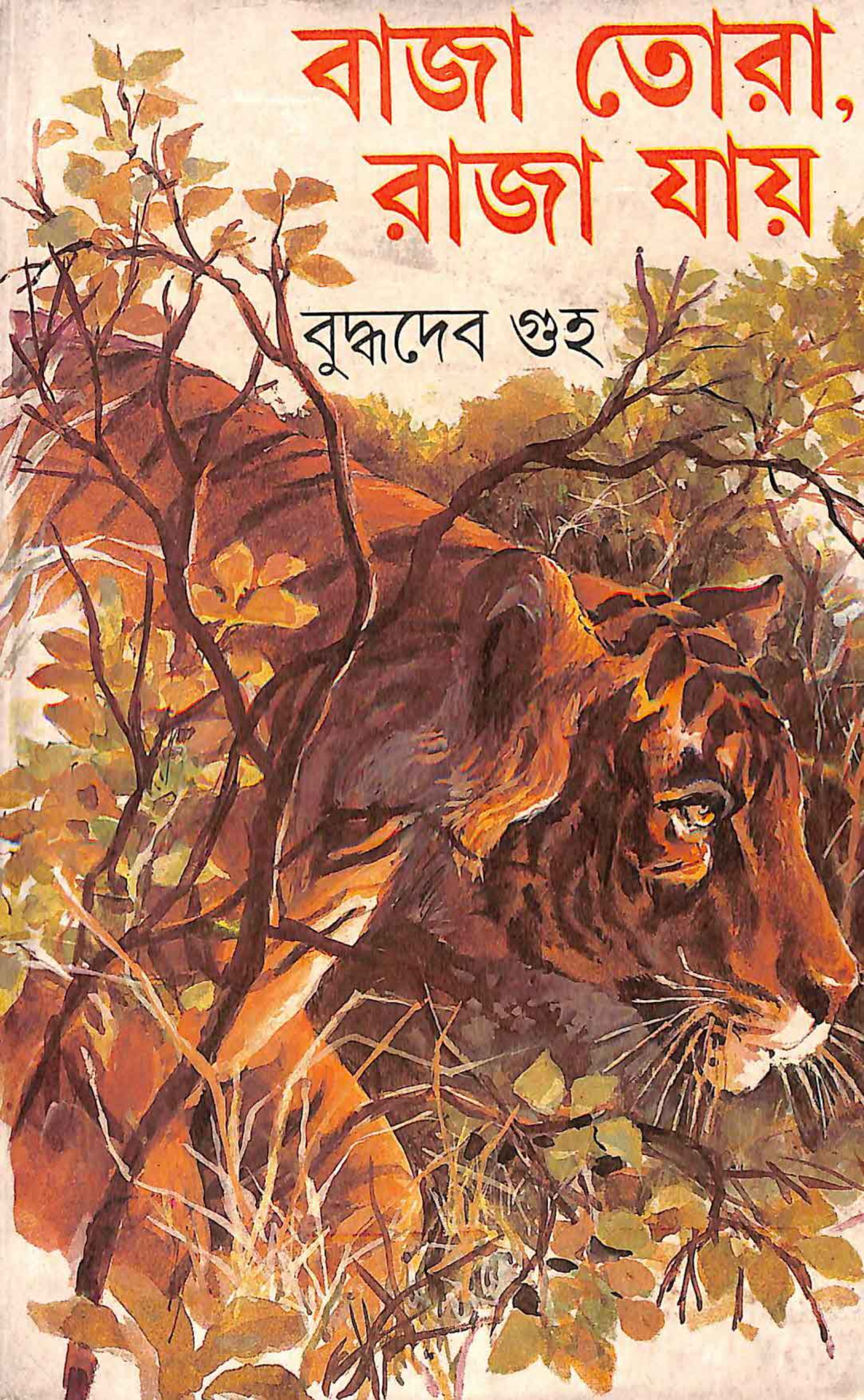
বাজা তোরা, রাজা যায়

বুদ্ধদেব গুহ



বাবা সোনা—
১৯৯৩ [illegible]
সবার ভালো হোক।
কৃষ্ণা পিসিমা—
১১/১/৯৩

বাজা তোরা, রাজা যায়

বুদ্ধদেব গুহ

দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, জানুয়ারি ১৯৯১
মাঘ ১৩৯৭

প্রকাশক
সুভাষ চন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা—৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি
সুধীর মৈত্র

অঙ্গসজ্জা
বিশ্বনাথ সাহা

মুদ্রক
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

দাম— ২০ টাকা

পালামৌর বেতলার বাঘ-বিলাসী সঙ্গম লাহিড়ীকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

রিয়া
ধুলোবালি
পঞ্চপ্রদীপ
সবিনয় নিবেদন
মাধুকরী
পারিধী
সোপর্দ
চবুতরা
স্বগতোক্তি
প্রথম প্রবাস
পঞ্চম প্রবাস
প্রথমাদের জন্যে
লবঙ্গীর জঙ্গলে
বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে
জলছবি, অনুমতির জন্যে
আয়নার সামনে
বুদ্ধদের গুহর শ্রেষ্ট গল্প
দূরের দুপুর
দূরের ভোর
জঙ্গল মহল
সুখের কাছে
জঙ্গলের জার্নাল

ঝাঁকি দর্শন
ভাবার সময়
কোজাগর
কোয়েলের কাছে
একটু উষ্ণতার জন্যে
বিন্যাস
দু নম্বর
অ্যালবিনো
নগ্ন নির্জন বাতিঘর
মহুলসুখার চিঠি
ঋভুর শ্রাবণ
টাঁড় বাঘোয়া
গুগুনো গুম্বারের দেশে
মউলির রাত
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
ওয়াই কি কি
বনবিবির বনে
হলুদ বসন্ত
বাবলি
নাজাই
পলাশতলীর পড়শী
যাওয়া - আসা

এখনও দু একটি মহুয়া গাছে ফুল আছে, তবে বেশির ভাগ গাছেই ফুল ফোটা শেষ। সেই একটি দুটি গাছের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ হাওয়া এলে হাওয়াটা ক্ষণিকের জন্যে হলেও জানান দিয়ে যায় যে বসন্ত শেষ হচ্ছে তবে গরম এখনও পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেনি বনে পাহাড়ে। সারারাত কোকিল আর ডাকে না এখন। তবে, নানা রাত-চরা পাখির সঙ্গে পিউ-কাঁহা ডাকে পাগলের মতো, বুকের মধ্যে চমক তুলে তুলে।

না। গরম আসেনি এখনও। তবে আসবে শিগগিরি। সেদিন

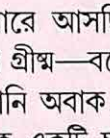
শেষ রাতে গুহার দিকে ফিরে আসছি পাহাড়ের মাঝের লাল মাটির নরম ধুলোর পথ বেয়ে। এমন সময়ে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখলাম দূরে। আগে লক্ষ করিনি। মানুষগুলোও চুপিসারে আসছিল। তাদের কারও-কারও মাথার ওপর হ্যাজাক জ্বলছে। তার আলো গ্রীষ্ম—বনে অনেকদূর অবধি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাকে দেখে যতখানি অবাক, আমিও ততখানি, ওদের দেখে।

মা, বুঝতে পেরে পেছন থেকে একটি চাপা আওয়াজ করতেই আমি এক লাফে ডান দিকের বাঁশবনের আড়ালে চলে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলাম।

ওদের মধ্যে একজন বলল, “বাজা রে বাজা, তোরা জোরে বাজা; রাজা যায়।”

বলতে-না-বলতেই সারা বন-পাহাড়ে মাদল, ধামসা ও কাঁসরের শব্দে রীতিমত হাঙ্গামা বেধে গেল।

ওরা আলোয়—ঝকমক করা পথে নানা বাজনা বাজাতে-বাজাতে চলে গেল।



কুন্দ্রু পাহাড়ের গা আর উপত্যকার শালবনে ফুল এসেছে। গন্ধে, দিন আর রাত ম-ম করে। বিকেলের দিকে, সারা-দুপুর যে-হাওয়াটা দামাল ছেলের মতো হুটোপাটি করে, বনে-পাহাড়ের আনাচকানাচ বহুরঙা শুকনো পাতা তাড়িয়ে

নাচিয়ে; সেই হাওয়াটাই হঠাৎ থেমে যায়। পাহাড়তলি থেকে ময়ূর ডেকে ওঠে। হনুমানেরা দূরের মালিখা পাহাড়শ্রেণীর উপত্যকার জঙ্গল থেকে ডাকতে থাকে হুপ-হুপ্-হুপ্-হুপ্ করে। মা, তখন আমাদের গুহামুখের দিকে সাবধানে এগিয়ে যায়। তারপথ আরও সাবধানে চারদিক চেয়ে গুহার সামনে যে অনেকখানি চওড়া কালো চ্যাটালো পাথরটা আছে, সেখানে একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে, একলাফে নীচের শুকিয়ে-আসা ল্যানটানার ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সামনের শুকনো পিছল পাতাঝরানো বাঁশবনের মধ্যে কোনো জায়গাতে আড়াল নিয়ে বসে।

আমরা তিন ভাইবোন তখন গুটিগুটি গুহামুখ অবধি এসে মা যেদিকে বসে আছে, সেদিকে চেয়ে গুহার মুখে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকি।

দিনের মৃত্যু আর রাতের জন্মের মধ্যে যে কতগুলি স্তর আছে তা মানুষেরা জানে না। আমরা জানি। দিনশেষে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় কী অপার সৌন্দর্য নিয়ে যে পৃথিবীতে সন্ধে নামে তা দেখার সময় মানুষদের মতো ভীষণই ব্যস্ত, টাকা রোজগারে বে-দম জীবদের তো নেই!

আমাদের ভাইবোনেদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট তার নামও ছোট। ছোট, ছোট; জিভ বের করে হ্যাঃ হ্যাঃ করছিল। পিপাসা পেয়েছে ওর খুব। আজ সারাটা দুপুর গরমও গেছে প্রচণ্ড। এই গরমে গুহার মধ্যে পাগলেরাই থাকে। কিন্তু আমাদের এই গুহায়, মানে বাড়ি; নিছক একটি গুহাই নয়।

আমরা গুহার একদিকের মুখে বসে আছি। গুহাটা আমাদের পায়ের মাপে, পঞ্চাশ পা মতো গিয়ে, মানুষেরা যাকে সমকোণ বলে; সেইরকম একটি সমকোণে বাঁক নিয়েছে বাঁদিকে। তারপর তিরিশ পা মতো গিয়েই খোলা জায়গা। উপরটা খোলা হলেও, অশ্বত্থ, বট, এবং নানা হরজাই গাছ, যাদের পাথর থেকেও রস নিতে অসুবিধে হয় না; তাদের ভিড়ে ছাওয়া। এবং নীচটাও গুহার অন্য প্রান্তের বনের একটি ঝরনা থেকে বয়ে আসা জলে-জলে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকে। বর্ষাকালে তো রীতিমত নদীই বয়ে যায় এই গুহার ওইদিকে, অবিরত ঝরঝরানি শব্দে। এখন জল নেই। তবে কাল অবধি একটু ভিজে-ভিজে ভাব ছিল। আজই তা পুরো শুকিয়েছে। তবু মাটি নরম থাকায় এবং ঝরাপাতার বিছানা পাতা থাকায় এবং মাথার ওপর স্তরের পর স্তরের চাঁদোয়া থাকায়, রোদ আসেনি যদিও; তবু গরম লেগেছে।

এখনই এই! তা এর পরে কী হবে, কে জানে! আমাদের গুহা যে পাহাড়ে, সেই পাহাড়ের নীচের ঝাঁটিজঙ্গলে তিতির, কালিতিতির, বটের, আস্কল, পাণ্ডুক, বনমুরগি, ছাতারে এবং আরও কত পাখি যে ডাকছিল তার ইয়ত্তা নেই। মালিখা পাহাড়শ্রেণীর সানুদেশে হঠাৎ একটি কোটরা হরিণ ডেকে উঠল চমকে-চমকে। ওই পাহাড়ে কোনও চিতা বা বাঘ নিশ্চয়ই জলে যাচ্ছে। নইলে

হনুমান আর কোটরারা এমন করে ডাকত না!

জলেই যাচ্ছে। এদিকে আসছে না। কারণ এদিকটা মায়ের এলাকা। অন্য কোনও বাঘ বা বাঘিনী এদিকে আসবে না। মা, নিজের গায়ের গন্ধ দিয়ে নিশানা দিয়ে রেখেছে বনের গাছের গুঁড়িতে-গুঁড়িতে, বড়-বড় নুড়িতে। দূর থেকে সে গন্ধ পেয়েই অন্য কোনও বাঘ এদিকে আসবে না। বাঘিনীও না। এলে মারাত্মক কাণ্ড হবে। লড়াই হবে মায়ের সঙ্গে। যে জিতবে, সেই থাকবে এই এলাকায়। যে-হারবে, তাকে চলে যেতে হবে অন্য কোথাও।

যে হেরে যায় দুজনের মধ্যে লড়াইয়ে সে অনেক সময় চলেও যেতে পারে না। যেখানে যুদ্ধ হয় সেখানেই আহত হয়ে পড়ে থাকে। তারপর ধীরে-ধীরে মরে যায়। তার ওপরে শকুন পড়ে। শেয়াল, হায়েনা এবং অনেক সময়ে ভালুকও এসে মাংস খায়। শজারুও। শুয়োরও খায় সময়-সময়, যদিও সে মূল-ফলেরই ভক্ত।

যুদ্ধের ফল যাই হোক আমাদের লড়াই নিরানব্বুই ভাগ সময়েই একা একা। দল বা গোষ্ঠীতে আমরা বিশ্বাস করি না মানুষদের মতো। বাঘেদের জীবনের সব ফয়সালাই আমরা একা একাই করি। জোরে জিততে না পেরে, দল লেলিয়ে দিই না অন্য পক্ষের বিরুদ্ধে। কখনওই। তেমন করতে আমাদের আত্মসম্মানে বাধে। আমরা যে বাঘ! মানুষ নই। অথবা অন্য জানোয়ারও যে নই!

পশ্চিমের আকাশটা আস্তে-আস্তে লাল হয়ে এল। তারপর গোলাপি। তারও পর কমলা। কমলার মধ্যে আবার হঠাৎ একটু হালকা নীল কোথা থেকে লেগে গিয়ে হঠাৎই হাঙ্গামা বাধিয়ে দিল। তারপর কোনও বিশেষ রং আর রইল না। না-দিন, না-রাত, দিন ও রাতের মধ্যের বেওয়ারিস ফালিটুকু এক আশ্চর্য আলোর আভায় আভাসিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পথ ভুলে দেরি করে ফেলা, একজোড়া ছোট্‌কি-ধনেশ, যাদের ইংরেজি নাম লেসার ইন্ডিয়ান হর্নবিলস; দ্রুত ডানায় মালিখা পাহাড়ের দাঁড়িয়ে থাকা সার-সার উঁচু কুচিলা গাছেদের ভিড়ের দিকে উড়ে যাচ্ছিল। মাঝে-মাঝে ডানা নাড়া বন্ধ করে দিয়ে গ্লাইডিং করে নিষ্কম্প ডানায় ভেসে যাচ্ছিল তারা পশ্চিমের আকাশের দিকে। তাদের মেলা-ডানায় দিন শেষের আলোর শেষ রেশটুকুকে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে।

অন্ধকার নেমে আসতেই মালিখা পাহাড়ের মাথার ওপরে সন্ধ্যাতারাটা স্নিগ্ধ নীলাভ সবুজাভ দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করে উঠল। দিনের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে দিনের হাওয়াটারও মৃত্যু হল। অন্ধকারে জন্মাল এক নতুন হাওয়া। শেষ মহুয়ার আর করৌঞ্জের গন্ধবাহী রুখু প্রান্তর আর সারাদিন রোদে-ঘামা পাহাড়দের গায়ের শিলাজতুর ঝাঁঝ—মাখা সে হাওয়া। মন্থর, চুপিচুপি পায়ে, থেমে-থেমে চলা, দমকে-দমকে গন্ধওড়ানো,মৃদু বনমর্মরের শব্দের রাতের ঝুমঝমি—বাজানো সে হাওয়া।

মা এবার আউঙ্ঘ্,আউঙ্ঘ্ করে দু'বার চাপা গলায় ডাকল। শুধু আমাদেরই শোনার জন্য।

আমরা তিন ভাইবোনে সাবধানে একে-একে গুহামুখ থেকে বেরিয়ে, ইতিউতি চেয়ে, সাবধানী, গুটিগুটি পায়ে ল্যান্‌টানা বা পুটুসের ঝোপে খস্‌খসানি যথাসম্ভব কম জাগিয়ে; পিছল, শুকনো বাঁশপাতা মাড়িয়ে বাঁশবনের মধ্যে মায়ের কাছে এলাম।

মা উঠে দাঁড়াল জলে যাবে বলে আমাদের নিয়ে। আর ঠিক সেই সময়েই নালাটি যেদিকে, সেদিক থেকে গদাম্ করে একটি জোর শব্দ হল। তারপরেই মানুষের গলার উত্তেজিত স্বর শোনা গেল। যেন বলল, "পড়েছে, পড়েছে"।

তারপরই দূর জঙ্গলের মধ্যে জিপগাড়ির আলোর আভা দেখা গেল জঙ্গল পত্রশূন্য বলে। মা বসে পড়ে ওইদিকে মুখ করে দু' কান খাড়া করে রইল। আমরাও মায়ের থেকে একটু দূরে-দূরে ছড়িয়ে আড়াল নিয়ে বসে যেদিক থেকে শব্দ আর আলো এসেছিল সেদিকে চেয়ে বসে রইলাম।

এত কিছু ঘটে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। পরক্ষণেই একদল শম্বর তাদের ভয়-পাওয়া ঢাংক্ ঢাংক্ ডাকে বন-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে দুড়দাড় করে জঙ্গল-ঝাড় ভেঙে, খুরে-খুরে খট্‌খটানি—তুলে ভীষণ ভয় পেয়ে, আয় তো আয় আমরা যেখানে বসে আছি সেদিকেই দৌড়ে এল। মা আস্তে করে শরীরটা ঘুরিয়ে পাঁচ পা মতো বাঁয়ে সরে গেল নিঃশব্দে এবং সরে গিয়েই শরীরটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল। দু' হাত আর দু' পায়ের দোলনার মাঝে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিল নীচে। তখন মাকে দেখে কে বলবে যে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠলে একটি বড় মোষের গলার সমান উঁচু মা।

শম্বরগুলো যখন বুঝল যে, তারা এক বিপদ থেকে বেঁচে অন্য বিপদের মুখে এসে পৌঁছেছে তখন অতর্কিতে উদভ্রান্তের মতো একইসঙ্গে ডেকে উঠল ঢাংক ঢাংক করে এবং ঠিক তখনই জিপের আওয়াজ এবং তীব্র স্পটলাইটের আলো এদিকে ছুটে এল। পথটা চড়াইয়ে, কারণ নালাটা অনেক নীচুতে। তা ছাড়া, পথে একটা সমকৌণিক বাঁক আছে এবং পথটা সেই জায়গায় ঘন হরজাই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসেছে, যেসব গাছের আধিকাংশরই পাতা এখনও ঝরেনি।আরও গরম পড়লে ঝরবে।

মা মুহূর্তের মধ্যে মুখ ঘুরিয়ে নিল এবং শম্বরগুলো আমাদের প্রায় ঘাড়েরই ওপর দিয়ে লাফাতে-লাফাতে চলে গেল।

একটা মস্ত শিঙাল ছিল দলে। তার অতিকায় ডালপালা ছাড়ানো শিংটাকে, তার পিঠের সমান্তরালে শুইয়ে নিয়ে মুখটা আকাশের দিকে করে; সকলের আগে আগে চলেছিল। যূথপতি।

মা তাড়াতাড়ি গুহার দিকে মুখ ফিরিয়েই তিন লাফে গুহার মুখে পৌঁছে



গেল। পৌঁছে গিয়েই সেই চ্যাটালো পাথরটাতে হাঁটু গেড়ে বসে আমরা ঠিকমতো এলাম কি না, তা দেখতে লাগল।

তিন ভাইবোনের মধ্যে আমিই বড়। আমার গায়ে জোরও সকলের চেয়ে বেশি।যদিও আমরা সকলেই সামান্য আগে পড়ে জন্মেছি তবুও আমাদের মধ্যে চেহারা ও গায়ের জোরের তফাত আছে। মেজটা বোন। ছোটটা ভাই। যার নাম আগেই বলেছি, ছোট।

আমি আর মেজো যে-পাহাড়ে গুহা, তার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। গিয়ে, ল্যান্টানার বা পুটুসের ঝোপের মধ্যে একেবারে মড়ার মতো নিশ্চল হয়ে সেঁধিয়ে গেছি। ছোট তখনও আসছে পেছন পেছন।তার নরম পায়ের পাতার নীচে মচ্‌মচ্ করে শুকনো পাতা গুঁড়োচ্ছে, শুনতে পাচ্ছি আমরা।

অন্ধকারেও আমরা দেখতে পাই। ছোটর গোল মাথাটার দু'পাশের কান দুটো মাথার পরিধির প্রায় অর্ধেক জায়গা নিয়ে রয়েছে। ছেলেবেলায় আমাদের কানগুলোকে প্রকাণ্ড বড় দেখায়।

আর-একটু এগিয়ে এলেই ছোট, ল্যান্টানার হিজিবিজি আড়ালে চলে আসবে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই জিপটা চড়াইটার ওপরে উঠে এল। এবং জিপের হেডলাইট দুটোর আলো অসমান, পাথুরে, লাল ধুলোর পথটিকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল। এবং স্পটলাইটের আলোটি এসে পড়ল একেবারে ছোটর ওপর। জিপটা দাঁড়িয়ে গেল। দু'জন মানুষ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, "বাঘ! বাঘ!"

ছোট, কৌতূহলভরে ওইদিকেই চেয়ে ছিল। আলো ওর দু'চোখে পড়ায় ও নড়তে পারছিল না। আটকে গেছিল। মা এবং আমি এবং মেজো আমাদের নিজ-নিজ জায়গাতেই শুয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে মড়ার মতো মিশিয়ে দিয়েছিলাম মাটির সঙ্গে আমাদের।

ছোট, আমাদের দিকে না এসে, আলোতে দিশেহারা হয়ে, জিপের দিকেই দু'পা এগিয়ে গেল।

একজন জিপ থেকে বলল, বাচ্চা।

সঙ্গে-সঙ্গে আর-একজন মানুষ তার রাইফেল তুলল ছোটর দিকে। নীলচে কালো ইস্পাতের রাইফেলের নল উজ্জ্বল আলোতে ঝকমক করে উঠল। এবং ঠিক সেই সময়েই মা এক লাফে নীচে পড়ে এমনই এক হুঙ্কার দিল আঁ-আঁ-আঁউ করে যে, মনে হল জিপের এ পাশের মস্ত শিমুল গাছটা বোধ হয় ভয়ে পড়েই যাবে। দিকে-দিগন্তরে পাহাড়ে-কন্দরে সেই ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল গুম-গুমানির সঙ্গে। মায়ের গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গেই জিপ থেকে রাইফেলের নির্ঘোষও হল, গুড়ুম। এবং মায়ের গর্জনের এবং গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে ঘা খেয়ে ফিরে আসার আগেই পড়ি-কি-মরি করে জিপ ঘুরিয়ে

নিয়ে বীর শিকারীরা আবার নালার দিকে ফিরে গেল। আমি বুঝলাম যে, ওরা হরিণ-শম্বর-খরগোশ-মারা শিকারী। যারা জীপে বসেও আমাদের দেখে জিপ থেকেও ভয়ে থরথর করে কাঁপে তাদের হাতে মরাও পাপ। মহাপাপ। মহালজ্জা।

গুলির আওয়াজের সঙ্গে-সঙ্গেই ছোট একটা প্রকাণ্ড লাফ দিল শূন্যে।তারপর শূন্যেই এক ডিগবাজি খেয়ে চিতপটাং হয়ে মাটিতে পড়ল। মায়ের মুখ দেখে মনে হল মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে। ছোট নিশ্চয়ই মরে গেছে। গুলি লেগেছে ওর। নইলে অমন করে লাফ সে দিত না। কিন্তু পরক্ষণেই ছোট লাফাতে-লাফাতে আমাদের গুহার দিকে দৌড়ে এল। জিপের হেডলাইট নিভে যেতেই, ও দিক ঠাহর করতে পেরেছে। দেখতে পাচ্ছে চোখে এখন ।

ও আসতেই আমরা ওকে ঘিরে ধরলাম। ছোট মুখটা পেছন দিকে বেঁকিয়ে তার লেজের কাছে নিয়ে গেল। আমরা দেখলাম তার লেজের ডগা থেকে ইঞ্চিখানেক কে যেন কেটে দিয়েছে। রক্তে লাল হয়ে গেছে জায়গাটা এবং সমানে রক্ত পড়ছে।

মা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিভ দিয়ে রক্ত চেটে-চেটে পরিষ্কার করে দিল। যন্ত্রণায় ছোট মুখ বিকৃত করে ফেলল। কিন্তু কাঁদল না একটুও। আমরা জাতে বাঘ। বিধাতা আমাদের কাঁদতে শেখাননি। আমরা হাসতে জানি, রাগতে জানি কিন্তু কাঁদতে জানি না। আমরা মেরে খাই কিন্তু পরেরটা কেড়ে কখনো খাই না।আমরা উপোস যাই, শিকার না করতে পেরে কিন্তু কখনও ভিক্ষে চাই না। মানুষদের সঙ্গে আমাদের অনেকই তফাত।

সকলেরই পিপাসা পেয়েছিল খুব। কিন্তু জলের জায়গা থেকে মানুষেরা সরে না গেলে সেখানে যাওয়া যাবে না।

একদল চিতল হরিণ পুবের উপত্যকা থেকে টাঁউ-টাঁউ করে ডাকছিল। ওদেরও পিপাসা পেয়েছে। কিন্তু জলে আসতে পারছে না ঐ একই কারণে। এই জঙ্গলে একদল গাউরও আছে। মানে ইন্ডিয়ান বাইসন। তাদের সর্দার দক্ষিণের পাহাড়ের কাঁধসমান জায়গাতে দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে 'বোঁয়াও' করে আওয়াজ করে বিরক্তি প্রকাশ করল। কিন্তু জলে যাওয়ার সময় এখনও হয়নি।চোট লেগেছে বলেই বোধ হয় ছোটটা পিপাসায় বেশি কাতর হল। জিভ দিয়ে বারবার মুখ চাটতে লাগল। লেজের ডগা দিয়ে রক্ত ঝরেই যাচ্ছিল। আমি ভেবে পেলাম না এই রক্ত—পড়া বন্ধ হবে কী করে!

প্রায় ঘন্টাখানেক আমরা ওই চ্যাটালো পাথরে বসে থাকলাম। দূরের মালিখা বস্তিতে মাদল বাজছে। নাচ হচ্ছে। এতদূর থেকেও তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে । অন্ধকার রাতের তারাভরা আকাশের চাঁদোয়ার নীচে বসে দূরাগত শব্দ একরকম শোনায়, আবার চাঁদের চাঁদোয়ার নীচে অন্যরকম। কেন অমন হয় কে জানে!

চাঁদের রাতে হাওয়াটাকেও অনেকেই অন্যরকম লাগে অন্ধকার রাতের চেয়ে।

মা তারপর একা পাথর থেকে নেমে গেল আবার। কিন্তু আগেরবার যেমন একটু পরই আমাদের ডেকেছিল, তেমন ডাকল না। আমি বুঝলাম, মা একা জলের পাশের পাহাড় থেকে ভাল করে দেখে আসবে বিপদ এখনও আছে কি না!

এবারে প্রায় একঘন্টা পরে মা ফিরে এল। এসে, ওই বাঁশবন থেকেই আউঙ্ আউঙ্ করে ডাকল আমাদের। ততক্ষণে ছোটর লেজটা ফুলে শক্ত হয়ে গেছিল। নিশ্চয়ই ব্যথাও করছিল খুবই। মা তাই জঙ্গলের পথ না ধরে পথের দিকে এগোল। পথে পথে গেলে ছোটর লেজটা ঝোপঝাড়ের সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতে পারবে সহজে। অবশ্য পথে পথে কিছুটাই আমরা যাব। তারপরই বাঁ দিকে ঘুরে গিয়ে নীচু পাহাড়টার মালভূমি বেয়ে গিয়ে জলে নামব।

ছোট, পিপাসায় ছটফট করছিল। মা তাই পিছিয়ে এসে আবার ছোটকে আদর করে ওর লেজ চেটে দিল। মানুষদের সঙ্গের কৃত্রিম আলো দেখলে যে আলোর বিপরীত দিকে, নিদেনপক্ষে অন্য দিকে মুখ ফেরাতে হয়, নইলে আলোয় দু চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যায়, দিগ্‌ভ্রম হয়; এ-কথা আমরা সকলেই সেই প্রথম শিখলাম, চোখের সামনে ছোটকে মরতে-মরতেও বেঁচে যেতে দেখে।

যে—শিকারী গুলি করেছিল, ভাগ্যে তার হাত ভাল ছিল না। ভাগ্যে বেশিরভাগ শিকারীর হাতই ভাল না। হাত নির্ভুল হলে আমাদের বেঁচে থাকাই মুশকিল হত। তবে সুখের কথা এই যে, অধিকাংশ শিকারীই খরগোশ-হরিণ-ময়ূর-মারা শিকারী। মাংস খাওয়ার জন্য শিকার করে। আমাদের ঘাঁটাবার মতো সাহস বেশি শিকারীর থাকে না। অবশ্য যারা জঙ্গলেরই মানুষ তারা আমাদের রাহান্-সাহান্ খাল-খরিয়ত্-এর খোঁজ রাখে। তারা আমাদেরই সঙ্গে বেড়ে ওঠে। তাদের সাহসও কম নয়। তাই তাদের হাতে দিশি গাদা বন্দুকের বদলে ভাল্ আগ্নেয়াস্ত্র পড়লে তাদের হাত থেকে বাঁচাও কঠিন হয় আমাদের। খুবই কঠিন হয়।

ছোট, আগে-আগে তার বড়-বড় কান আর বাঁকানো লেজ নিয়ে (গুলি খাওয়াতে লেজটা গুটিয়ে নিয়ে চলেছিল সে) লটর্-পটর্ করে চলেছে। তার পেছনে মা, এই চার-পাঁচ পা পেছনে। তার পেছনে মেজো। সবশেষে আমি।

হঠাৎ ডান দিকের জঙ্গল থেকে একটা ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ হল। মা থমকে দাঁড়াল। আমরাও। শুয়োর। খিদে সকলেরই প্রচণ্ড। মা পথ ছেড়ে ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকল। আমারা ছোট হলেও তো একেবারে ছোট নই। প্রায় পনেরো মাস হতে চলল্ আমাদের বয়স। মা শিকার ধরলে, আমরা তারপর এসে মাকে সাহায্য করি। মা অবশ্য আগে আমাদের খেতে দেয়। আমরা পেটপুরে খেলে মা নিজে খায়। যতদিন আমরা দুধ খেয়েই বেঁচে ছিলাম ততদিন মা একা-একাই

শিকার করত। তার বেশ কিছুদিন পরে মা শিকার করে তারপর আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে খাওয়াত। শিকার করার সময় শিকারের কাছে থাকতাম না। এখন তো আগের চেয়ে বড় হয়েছি। এখন তাই অন্য কথা।

মাকে অনুসরণ করে আমি আর মেজো জঙ্গলে ঢুকে গেছি একটুখানি। শুয়োরটা একটা খোলামতো জায়গায় কী মূল যেন খুঁড়ে খাচ্ছিল। কান্দা, কি গেঁঠি হবে। নয়তো অন্য কোনও মূল। মাকে বা আমাদের। শুয়োরটা দেখতে পায়নি। গন্ধও পায়নি। শুয়োরও গন্ধ পায় কি না এখনও জানি না আমি। আমাদের নিজেদের গন্ধবোধটা কম। প্রায় নেই বললেই চলে। হাওয়াটা শুয়োরটারই দিক থেকেই আসছিল। তাকে এখনও চোখে দেখিনি তবে ঘোঁতঘোঁতানি শুনেই বোঝা গেছে যে, বেশ বড় শুয়োর। বড় দাঁতাল শুয়োরগুলো ভারী পাজি হয়। বাঘকেও মোটে পাত্তা দেয় না। তাদের পেছন থেকে কায়দামতো ঘাড়ে পড়ে টুঁটি না চেপে ধরতে পারলে অনেক সময় বড়-বড় দাঁত দিয়ে আমাদের ফালা-ফালা করে দেয় তারা। মানুষদের বস্তিতে যেসব শুয়োর দেখা যায় তাদের সঙ্গে এদের কোনওই মিল নেই। বিরাট হয় এদের চেহারা। এবং একেবারেই বেপরোয়া। কাউকেই গ্রাহ্য করে না এরা। আমরা বুনো শুয়োর আর বন জঙ্গলের লাগোয়া গাঁয়ের শুয়োর দুইই দেখি, তাই জানি যে, পোষা শুয়োরদের লেজ শোয়ানো থাকে আর বুনো শুয়োরের লেজ উপর দিকে উঁচিয়ে থাকে। আমাদের নিজেদের লেজও সোজা লাঠির মতো শক্ত করে উঠিয়ে দিই আমরা, এদিক ওদিক বাঁকাই যখন রেগে যাই তখন। না-রেগেও দু একসময় অমন করি কোনো কারণে উত্তেজিত হলে।

এবারে শুয়োরের পায়ের খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল।পা দিয়ে এবং দাঁত দিয়ে তো মাটি খোঁড়ে ওরা। আমি আর মেজো এখানেই থাকব, না আরও এগোব তাই ভাবছি, এমন সময়ে আমাদের খেয়াল হল যে, ছোট সঙ্গে নেই। যেই সে-কথা মনে হওয়া, সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার উপরিভাগ থেকে একটি গুলির শব্দ হল। আমরা চমকে উঠলাম। মা কোথায় তাও আমরা জানি না। মাকে দেখা যাচ্ছে না। শুয়োরটা আমাদের চেয়েও বেশি চম্‌কে উঠে ঘোঁত-ঘোঁত-ঘোঁত আওয়াজ করতে-করতে কুন্দ্রু পাহাড়ের দিকে দৌড়ল। আর তক্ষুনি আমরা মাকে দেখতে পেলাম। মা গুঁড়ি-মারা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পথে না নেমে পথের পাশের ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে পথ-বরাবর দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল। আমরাও, দূরত্ব রেখে, মায়ের পেছন-পেছন এগোতে লাগলাম।

আমরা যখন পথের বাঁকের কাছে এসেছি তখন আবার জিপের আওয়াজ আর আলো শুনতে ও দেখতে পেলাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে যে যেখানে ছিলাম আড়াল নিয়ে মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেলাম। অনেকগুলো মানুষ একসঙ্গে কথা বলে উঠল।

একজন বলল, "গুড শট।"

অন্যজন বলল, "কনগ্রাচুলেশানস।"

কী ঘটল, বুঝতে না পেরে আমি সাহস করে আর-একটু এগিয়ে গেলাম যাতে আড়াল থেকে দেখা যায়। বাঁকের কাছেই কতগুলো ঘন কেলাউন্দা ঝোপ ছিল। তার আড়ালে শুয়ে পড়ে দেখলাম, ছোটর শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ছোটকে ধরে, চার-পাঁচজন লোক জিপের ওপরে ওঠাচ্ছে।আর পথের বাঁকের একটু দূরের একটি সাহাজ গাছের ওপর থেকে একজন খাকি পোশাক-পরা শিকারী নেমে আসছে। তার হাতের রাইফেলের সঙ্গে লাগানো একটি সুইচ টিপলেই আলো জ্বলে ওঠে রাইফেলের পেছনে, এবং সামনের নিশানা করার জিনিসে আলো পড়ে এবং যাকে নিশানা করা হচ্ছে তারও গায়ে।

একজন মানুষ বলল, "এটা বাচ্চা রে! মাও আছে কাছাকাছি।এই অঞ্চলে মোষ বেঁধে বসলেই মাকেও পাওয়া যাবে।"

অন্যরা বলল, "কাল থেকেই মোষ বাঁধা শুরু করো দু-তিন জায়গায়।"

আমরা মড়ার মতো পড়ে রইলাম, কারণ মাও তাই করছিল। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল যে, এক লাফে ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ে এক-এক থাপ্পড়ে ওদের মাথাগুলো ধড় থেকে আলাদা করে দিই। ওরা তো অল্‌কা-পল্‌কা মানুষ। ওদের সকলকে ছোট একাই মারতে পারত যদি ওরা খালি হাতে, মাটিতে নেমে, আমাদের সঙ্গে লড়াই করত।

ছোটকে উঠিয়ে, জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে ওরা চলে যাওয়ার সময়ও মা কিছুই বলল না।

প্রায় মিনিট পনেরো পর মা এবং আমরা একে-একে গিয়ে ছোট যেখানে শুয়ে ছিল সেখানে পৌঁছলাম। ছোটর গরম রক্তে পথের মাটি ভিজে ছিল। পেট্রলের জিপের এগজস্ট পাইপ থেকে বেরুনো ধোঁয়ার গন্ধে জঙ্গলের স্বাভাবিক গন্ধ মুছে গেছিল। মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, ছোটর রক্তের গন্ধ শেষবার শুঁকে, জলের দিকে নয়; তার উলটো দিকে চলা শুরু করল।

ছোটটা বড় পিপাসা বুকে নিয়ে চলে গেল।



আমাদের এলাকাতে একটা বড় চিতাবাঘ ঢুকে পড়েছিল। মায়ের সঙ্গে তার জোর লড়াই হয়। সে হেরে চলে যায়। হয়তো বাঁচবে না। কিন্তু মায়েরও খুব চোট লেগেছে। মা, বমি করেছে দু'বার আজ সকালে। নিজেই কিছু জংলি পাতাপুতা চিবিয়েছে। আমরা দেখে নিয়েছি, কী পাতা চিবোল। পাতা চিবোনোর পর ঝরনাতে গিয়ে জল খেয়ে এসে সারাদিন শুয়ে থেকেছে।

আজ সন্ধের মুখে একটা চিতলহরিণ মেরেছিলাম আমি। বয়েও নিয়ে গেছিলাম একটি ঠ্যাং মায়ের জন্য। মা খায়নি। মায়ের অবস্থা দেখে আমার মন ভাল নেই।

এখন আমাদের যে আস্তানা, এটাকে বাড়ি না বলে, আস্তানা বলাই ভাল; সেটা পাহাড়ের ওপরে নয়। গভীর জঙ্গলময় এক উপত্যকায়। দু'দিকে দুই পাহাড় উঠে গেছে খাড়া,প্রায় দেড়-দু' হাজার ফিট। তারই মধ্যে এই সংকীর্ণ খাদ। উপত্যকা না বলে খাদ বলাই ভাল। দু'দিকেরই পাহাড়ে বর্ষাতে ধস নেমে-নেমে পাথরের গা বেরিয়ে গেছে সবুজ আস্তরণ ভেদ করে। কোয়ার্টজাইট, গ্রানাইট, ব্যাসাল্ট, ডোলোমাইট ইত্যাদির চাঙড় বেরিয়ে আছে সাদা কালো লাল নীল দাঁত বের করে। এই দুই পাহাড়ের মধ্যের খাদে ডান দিকের পাহাড় থেকে একটি মস্ত অশ্বত্থ গাছ পাহাড়ের গায়ের সবুজ আস্তরণের সঙ্গে প্রথম বর্ষণে ধসে গিয়ে, খসে পাহাড় গড়িয়ে এসে এই খাদে পড়েছিল। সেই গাছটির মস্ত মোটা খোলে একটি ফোকর ছিল। ফোকরের মধ্যে দিয়ে বর্ষার ঝরনার প্রচণ্ড বেগবতী স্রোত বয়ে গিয়ে সেই ফোকরকে মস্ত বড় ও লম্বা করেছিল। বছরের পর বছর জল চলে-চলে তার বাইরে এবং ভেতরটাও মসৃণ হয়ে গেছিল। সেই ফোকরের মধ্যে বাস করত মস্ত বড় একটা ময়াল সাপ। সে কিছুতেই তার বাড়ি ছাড়তে রাজি ছিল না। মা, আমি আর মেজো একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করে অনেক কষ্টে কাবু করেছিলাম। মরতে-মরতেও সে আমাকে একবার পেঁচিয়ে ধরেছিল। যদ্দি-পুরো লেজ দিয়ে পেঁচাতে পারত তবে হাড়গোড় আমার একটিও আস্ত থাকত না। সময়মতো মা তার কোমরটাই কামড়ে-ছিঁড়ে দু' টুকরো করে না দিলে আমার বাঁচাই হত না সে-যাত্রা। যাই হোক, কুণ্ডলী পাকিয়ে

চারদিকে বালি পাথর গাছগাছালি লণ্ডভণ্ড করে সে যখন শেষমেশ শান্ত হল এবং মরল তখন তার মাংস খেয়ে বড় তৃপ্তি হয়েছিল। ঠাণ্ডা রক্তের জানোয়ারের মাংসর স্বাদ আলাদা। যখন আরও ছোট ছিলাম, তখন ব্যাঙ ধরে খেতাম। ব্যাঙও ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী। তবে অজগর বা ময়াল সাপের মাংসের তুলনা নেই। উষ্ণ রক্তের জানোয়ারের মধ্যে একমাত্র ময়ূর, চিংকারা আর মাউস-ডিয়ারের মাংসের সঙ্গেই এই মাংসের তুলনা চলে।

তারপর থেকে এই অশ্বত্থ গাছই আমাদের বাড়ি। গাছটির ফোকরে আমি, মা আর মেজো তিনজনেই লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে পারি। দিনের বেলায় এই খাদে রোদ পৌঁছয় না। ছায়াচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা; নিস্তব্ধ থাকে। কিছুদিন আগে এখানে জলও ছিল। তিরতির করে জল বয়ে যেত। ছোট-ছোট মাছও ছিল জমা জলের কুণ্ডতে। এখন জল আর নেই। কিছুটা জায়গার বালি এখনও ভেজা আছে। মেজো সেই বালি খুঁড়ে জল বের করে জল খায় কখনও-কখনও।মেজোটা ভারী কুঁড়ে আর আয়েসি।

সেই ভেজা বালিতে রোজ বিকেলে কয়েকশো লাল প্রজাপতি আসে জল খেতে। সন্ধের অনেক আগে ওরা দল বেঁধে আসে আর বালি ছুঁই-না-ছুঁই করে একবার উড়ে আর-একবার বসে জল খায়। বেশ লাগে দেখতে। ওরা চলে গেলে কিছু পাখিও আসে। ছোট-ছোট পাখি। মুনিয়া, বুলবুলি, মৌটুসি, ফিঙে, দোয়েল, কোকিল এবং নানা পোকা-ধরা পাখি। সাপও আসে নানারকম। বিষাক্ত সাপগুলোর চাল অন্যরকম। ওরা এঁকেবেঁকে চলে। ধুলোবালিতে ওদের চলার দাগও পড়ে আঁকাবাঁকা। আর যে-সাপেদের বিষ নেই তাদের চলা মোটামুটি সোজা। নির্বিষ সাপের বুকে হেঁটে চলার দাগ দেখে মনে হয় কোনও মানুষ তার হাতের লাঠিকে শুইয়ে টেনে নিয়ে গেছে বুঝি। ধুলোর ওপর দিয়ে সাপেদের পেছন-পেছন ময়ূর আর বেজি আসে সাপ ধরতে। পাহাড়ী ঈগলও ছোঁ মেরে সাপ ধরে তুলে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় পাখি। উড়তে-উড়তেই খেয়ে ফেলে তাদের। কিন্তু এখানে সাপ ও পাখিরাও নিরাপদ। এই দু' পাহাড়ের মধ্যের খাঁজটুকু আকাশ থেকে দেখা যায় না। এর চন্দ্রাতপে একটুও ফাঁকফোকর নেই এই গ্রীষ্মদিনেও। বর্ষায় ও শীতে তো তা আরও পুরু হবে। এ কারণেই আমাদের পক্ষেও শিকার ধরে এখানে নিয়ে এসে ফেলে রাখা খুব সুবিধের। ওপর থেকে শকুনেরা তা দেখতে পায় না। মানুষের চোখ তো পড়েই না। মানুষ এই দুর্গম নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে আসেও না। শিকারিরা অবশ্য আসে, কারণ বাঘেদের মতোই তারা। তাদের অগম্য জায়গা নেই। তবে এইখানে এসে আস্তানা গেড়ে বসা অবধি কোনও মানুষকে এদিকে আসতে দেখিনি আমরা।

গোলগাল হাতির বাচ্চার স্বাদু মাংস খেতে-খেতে মা একদিন আমাদের বলেছিল যে, এই হাতির পালের একজনের সামনেও যদি আমরা কেউই পড়ে

যাই, তবে বিপদ আছে। হাতিরা সবই মনে রাখে।

বিপদ! বিপদই তো আমাদের জীবন! আমাদের হাতে অন্যের বিপদ। অন্যের হাতে আমাদের বিপদ। বিপজ্জনক বলেই তো আমাদের জীবন এত আনন্দের।প্রতি মুহূর্তে প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার খেলারই আর-এক নাম তো বাঘেদের বেঁচে থাকা!

যেদিন ছোটকে ফেলে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত আমরা এই আশ্রয়ের দিকে হাঁটা দিয়েছিলাম সেদিন মাঝপথে একটি উঁচু টিলার ওপরে বিশ্রাম করার সময়ে আমি মাকে শুধিয়েছিলাম, "ছোটকে যে মানুষেরা নিয়ে গেল মা, ওরা কি ছোটর মাংস খাবে?"

মা জবাব দেয়নি। আমরা বুঝেছিলাম যে, খাবে না।

"মানুষে বাঘের মাংস খায় না।"

মা, না বলেই বলেছিল।

"তবে, মানুষ বাঘ মারে কেন? বাঘেরা যেসব জানোয়ার মারে তা তো তাদের খাদ্য বলেই মারে। কখনও-সখনও অবশ্য মানুষও মারে বাঘে। কিন্তু সে তো খাওয়ার জন্য নয়। হঠাৎ কোনো কারণে ভয় পেয়ে বা রেগে গিয়ে মারে। শিকারি মানুষ, যারা আমাদের মারতে আসে; তাদের বজ্রের মতো গুলি খেয়ে প্রতিহিংসায়ও অনেক সময় মারে। ছোট বাচ্চা নিয়ে মাও যখন রয়েছে তখন মানুষ কাছে চলে এলে বাচ্চার বিপদের আশঙ্কায় হয়তো মারে। দুপুরবেলায় ঝোপের মধ্যে আমরা কেউ বিশ্রাম করছি এমন সময় ঘাস কাটতে-কাটতে কেউ আমাদের নাকেরই ওপর কাস্তে চালিয়ে দিলে, বিরক্তিতে হয়তো মারি। কিন্তু নইলে মানুষকে আমরা ভয় করি, এড়িয়েও চলি, তখনও, তবু মানুষ আমাদেরই মারে কেন?"

মা বলেছিল, "মানুষ বাঘ মারে বাহাদুরির জন্য। অন্যকে দেখাবার জন্য। নিজের শৌর্যবীর্যের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার জন্য।"

"তা হলে খালি হাতে আসে না কেন?"

"বন্দুক রাইফেলও তো মানুষের বুদ্ধি দিয়েই তৈরি। খালি হাতের মানুষ তো একটা ছাগলের সঙ্গেও লড়াইয়ে হেরে যাবে। হেরে যাবে, কোটরা হরিণের সঙ্গেও। তার বুদ্ধিই তার নখ, দাঁত; তার সব জোর।"

"বুদ্ধি? না দুর্বুদ্ধি?"

"সেটা মানুষদেরই বিচারের বিষয়। আমাদের চামড়া আর মাথা ওরা বাড়িতে টাঙিয়ে রাখে। গর্ববোধ করে অন্যদের দেখিয়ে।"

"গর্ববোধ করবে বলে ছোটকে মারল ওরা? খাওয়ার জন্য নয়?"

"না, খাওয়ার জন্য নয়।"

"মানুষ তো কত কিছু করেই গর্বিত হতে পারে। তার বুদ্ধি দিয়ে তৈরি রাস্তা,

ব্রিজ, বাড়ি, গাড়ি, বন্দুক, রাইফেল, বিজলী আলো। সে তো বরফ-ঢাকা পাহাড় চড়তে পারে, পেরোতে পারে সমুদ্র, আমাদের পৃথিবী আমাদের ফেরত দিয়েও স্বচ্ছন্দে গর্ববোধ করতে মারে। তা না করে, আমাদের চামড়া আর মাথা দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে এ কেমন গর্ববোধ?"

"মানুষেরাই জানে তা।"

"আমরা কখনও মানুষদের গর্ব চিবিয়ে খেতে পারি না মা?" মা যেন হাসছে এমনই একরকম মুখভঙ্গি করেছিল।

মানুষদের মতো হাসি বাঘেরা হাসে না।

বলেছিল, "মানুষদের গর্বের তো হাত-পা নেই, শরীর নেই, মাথা নেই; লেজ নেই। খাবি কী করে?"

তা হলে মানুষদের গর্ব খাওয়া যায় শুধুমাত্র আস্ত মানুষকে খেয়েই? গর্বিত মানুষকে? তাকে তার গর্বসুদ্ধু চিবিয়ে খেলে তবেই তার গর্ব মরে। মানুষের গর্বকে আলাদা করে খাওয়া যায় না বোধ হয়।

কথাটা বড় ভাবিয়েছিল আমাকে। আমি ঠিক করেছিলাম গর্বিত মানুষ যদি চিনতে পারি তবে তার সব গর্বসুদ্ধু তাকে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাব। যারা ছোটকে, খাওয়ার জন্য নয়, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্য আমাদের সকলের চোখের সামনে গুলি করে মেরে তার পিপাসার্ত রক্তাক্ত দেহটাকে তুলে নিয়ে গেল, সেই মানুষদের পেলে ছাড়ব না।

মা কিছুই খায়নি। মায়ের জলপিপাসা পেয়েছে খুব। কিন্তু উঠে যে ঝরনাতে যাবে, তেমন বল নেই শরীরে। মেজোর কাঁধের কাছে ঘা হয়ে গেছে। আজ দুপুরে এবং বিকেলেও বড়-বড় নীল মাছিগুলো বনবন শব্দ করে তার ক্ষতর ওপরে-ওপরে উড়ছে। বিরক্ত করছে খুবই। সন্ধে নামার সঙ্গে-সঙ্গে তারা চলে গেছে। সেদিক দিয়ে এখন শান্তি। মেজো এতটাই আহত হয়েছে যে গাছের ফোকর থেকে বেরিয়ে বালি খুঁড়ে যে জল খাবে তেমন জোরটুকুও তার গায়ে নেই। আমিও যে, কোনও বুদ্ধি করে ঝরনা থেকে জল এনে মাকে আর মেজোকে খাওয়াব তেমন কোনও বুদ্ধি আমার জানা নেই। আমার পায়ে হাতে দাঁতে নখে জোর আছে খুব। রেগে গেলে আমি গাছ ও পাথর আমার হাতে—দাঁতে গুঁড়িয়ে দিতে পারি, কিন্তু ঝরনা থেকে কোনও বুদ্ধি করে জল এনে অসুস্থ মা এবং আহত বোনকে খাওয়াই তেমন কোনও বুদ্ধি আমার নেই।

যার বুদ্ধি নেই, তার কিছুই নেই। এইজন্যই মানুষদের গায়ের জোর মুরগির মতো হলেও ওদের বুদ্ধির বা দুর্বুদ্ধির জোরেই ওরা বাঘ বাইসন হাতি সকলের ওপরেই কর্তৃত্ব করে!

যখন কিছুমাত্রই করার নেই মা বা বোনের জন্য, তখন আমি ফোকর থেকে বেরিয়ে এই চন্দ্রাতপের আড়াল থেকে খাদ ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এলাম।

আমাদের বাঘেদের সমাজ বলে কিছু নেই। পরিবার বলেও নয়। পনেরো মাস বয়স তো হয়ে গেছেই। হয়তো আরও তিন থেকে ছ'মাস মায়ের সঙ্গে থাকব আমরা। তারপর মা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। আমরাও মাকে ছেড়ে। দু'ভাইবোনও একসঙ্গে থাকব না। দু'জন দু'দিকে চলে যাব। অন্য কারও সাহায্যের প্রত্যাশাই বাঘ বা বাঘিনী করে না। সমস্ত পৃথিবীতে আমরা আমরাই। একক। আমাদের মতো একক জীবন আর কোনো প্রাণী বা মানুষেরই নেই। সারা জীবনই একা। বেশি হলে, ন'মাসে ছ'মাসে কিছুদিন কোনও সঙ্গী সঙ্গিনীর সঙ্গে তারা থাকে মাত্র। তারপর আবারও আলাদা। বাঘিনী হলে ছেলেমেয়ে হওয়ার পর তারা যতদিন না নিজেরা জঙ্গলের আইনকানুন জানছে, শিকার ধরে খেতে শিখছে; ততদিনই একসঙ্গে থাকা। বাঘ তার সন্তানদের সঙ্গে আদৌ থাকেনা। মা বাবা ভাই বোন সবাই আলাদা আলাদা।

আমরা শিগগিরই যেমন হব।

বাঘেদের জীবনে, আমরা কেউই কারও দয়া, মায়া, মমতা, সেবা, শুশ্রূষা, ভালবাসা, এমনকী ঘৃণারও পাত্র নই। আমরা প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সম্পূর্ণ হই বা না হই আমরা অন্যনির্ভর নই কোনও ব্যাপারেই। আমরা সম্পূর্ণই স্বয়ম্ভর। আমাদের কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। কোনও বাঘ কোনও বাঘকে কৃতঘ্নতার দোষেও দোষী করেনি কোনওদিন। অন্য কোনও বাঘের নিমক খায় না কোনও বাঘ, তাই নিমকহারামির প্রশ্নও ওঠে না। সমব্যথা, সমবেদনা, করুণা, দয়া, মমতা, বন্ধুতা, ভালবাসা এসব বোধও বাঘের অভিধানে নেই। বাঘের সঙ্গে সম্ভবত একবিংশ শতাব্দীর মানুষদের তুলনা করা যাবে। জানোয়ার-বাঘেরা যেমন ভেতরে-ভেতরে মানুষ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে গোপনে, তেমনই প্রকাশ্যে তাদের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে মানুষেরা জানোয়ার এবং বাঘ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। একদিন শিগগিরই আসবে যখন জানোয়ার-বাঘ আর মানুষ-বাঘে তফাত বিশেষ থাকবে না।

ডান দিকের পাহাড়ের গায়ে উঠে, ধীরে-ধীরে আমি তার মাঝ-বরাবর যে বড়-বড় পাথরগুলো স্তূপীকৃত হয়ে আছে, সেখানে এসে পৌঁছলাম। এই জায়গাটা মায়ের "ওয়াচ-টাওয়ার"। এখান থেকে সামনের পাহাড়টা, পাহাড়ের নীচ দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীটা এবং প্রায়-খোলা উপত্যকার অনেকখানি দেখা যায় পরিষ্কার।

প্রতিদিন সূর্য ডোবার আগেই এখানে এসে আমরা বসি। সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর চালিয়ে দেখি, কোথায় কোন্ জানোয়ার চরছে। তারপর পছন্দসই কোনও জানোয়ারকে পিছা করি। আফ্রিকার সিংহ বা চিতাদের মতো আমরা জানোয়ারের পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে পেছন থেকে তাদের কাছে পৌঁছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারি না। সিংহরাতো দল বেঁধে শিকার করে। আমরা তা কখনও

করিনা। আমরাই হচ্ছি সত্যিকারের শিকারী জানোয়ার। দিনের আলো ছায়ায়, চাঁদের রাতের সাদা কালোয়; চুপিসাড়ে আমাদের চলা ফেরা। অনুসরণ করে যে-কোনও জানোয়ারকে বাগে আনতেই বহুক্ষণ লাগে। কখনও এক ঘন্টা, কখনও তিন-চার ঘন্টা, কখনও-বা সারারাত। কোনও-কোনও রাতে আমাদের পাঁচ থেকে পনেরো-কুড়ি মাইলও হাঁটতে হয়, পেটের খিদে তেমন চনচনে হলে। শিকার পেয়ে গেলে, তো মিটেই গেল।

অবশ্য রোজ রাতেই যে টহল মারতে হয়, এমন নয়। বড় শিকার, যেমন শম্বর, নীলগাই, বড় চিতল হরিণ, খুব বড় শুয়োর ইত্যাদি পেলে দু-তিনদিনের খাবারের সংস্থান হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যে মুখও তিনটি। এবং আমরা আর তেমন ছোটটিও নেই। তাই এক রাতেই বড় শিকারও ফুরিয়ে যায় আজকাল। মা হয়তো শিগগিরই আমাদের ছেড়ে চলেও যাবে। আমাদের জন্যে মায়ের নিজস্ব একাকী স্বাধীন জীবনযাত্রা এখন কিছুটা যে ব্যাহতও হয় না; এমনও নয়।

এখনও কৃষ্ণপক্ষ চলছে। আজ মাঝরাতে চাঁদ উঠেছে। একফালি। হাওয়া বইছে একটা, এলোমেলো। এখন আর তেমন গরম নেই হাওয়াটা।

সামনের পাহাড়টার নাম টারা। তার সামনের নদীটার নামও টারা। যেমন মালিখা পাহাড়শ্রেণীর নীচের নদীর নামও ছিল মালিখা। টারা নদীর ধারে খোলা মাঠে এখনও বড়-বড় ঘাস আছে। খোলা মাঠ, মানে, একেবারেই যে খোলা, তা নয়। মাঝে-মাঝে গাছ আছে। শিমুল আর পলাশই বেশি। শিমুলের টানটান হাত সমান্তরাল রেখায় দু'দিকে ছড়ানো। পলাশ জংলি গাছ। প্রতি বর্ষার পর অসংখ্য চারাগাছ জন্মায়। তবে এ গাছগুলোকে লোকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে এবং নরম কাঠ বলে কাটতেও সুবিধা বলে গভীর জঙ্গলের ভেতরে ছাড়া গাছগুলো তেমন বড় হওয়ার সুযোগই পায় না।

যে-পাহাড়ে আমি বসে আছি তার নাম, লাংড়া। এর গায়ে মস্ত-মস্ত পলাশ আছে অনেকগুলো। গ্রাম থেকে দূরে, তা ছাড়া দুর্গম জায়গায় বলেই এগুলো অক্ষত আছে এখনও।

টারা নদীর পাশের ঘাসবনে একদল চিতল হরিণ চরছে। প্রায় চোদ্দ-পনেরোটা আছে দলে। কিন্তু তাদের পেছনে গিয়ে লাভ নেই। যেতে হলে, পাহাড়তলির ঘন জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হবে। সেখানে দু'জোড়া কোটরা হরিণের বাস। তা ছাড়া হনুমান এবং ময়ূরও অসংখ্য। আমাকে দেখেই তারা বারবার ডেকে চিতল হরিণের দলকে সাবধান করে দেবে। তাই ভাবলাম, মিছে পরিশ্রম করে লাভ নেই।

মাঝরাতের চাঁদের আলোর সামনের উপত্যকা, টারা নদী, পাহাড়, ঘুমন্ত টারা—বস্তি সবই মোহময় দেখাচ্ছে। কিন্তু বাঘেদের জীবনে কাব্যির জায়গা নেই। বদগন্ধ-রক্ত, কাঁচা-মাংস, নখে-দাঁতে চামড়া ছাড়ানো। মারা আর মরা। বড়

বিচ্ছিরি কিন্তু সোজাসুজি ঝামেলাহীন জীবন আমাদের।

পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে নামলাম পাহাড়তলির জঙ্গলের দিকে। সেই ঘন জঙ্গলের চন্দ্রাতপের নীচে একবার গিয়ে পৌঁছলে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তবে আমরা তো অন্ধকারেও দেখতে পাই তাই আমাদের অসুবিধে হয় না। জানোয়ার—চলা শুঁড়ি পথ থাকে সব জঙ্গলের মধ্যেই। সেই পথে চোখ কান সজাগ রেখে আস্তে আস্তে এগোলাম। পথটা গিয়ে পড়বে টারা নদীর পাশের অপেক্ষাকৃত খোলা পাড়ে। তার কাছাকাছি পৌঁছলেই আলো ফুটবে, পাহাড়ের মধ্যের টানেল-এর শেষাশেষি পৌঁছে যেমন আলোর আভাস দেখা যায় এবং ধীরে ধীরে তা স্পষ্টতর হয়, তেমনই দেখা যাবে এবং স্পষ্টতর হবে।

কিছুটা গিয়েই হঠাৎ ডানদিকে একটা আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালাম। মানুষেরা, থাকে বলে 'ফ্রিজ' করে যাওয়া; তাই করে গেলাম। 'ফ্রিজ' করে যাওয়ার শিক্ষা আমাদের প্রত্যেককেই ছোট্টবেলা থেকে দেওয়া হয়।

আওয়াজটা হচ্ছিল দু-তিনশো পা দূর থেকে। কিন্তু এতটুকু দূরত্ব অতি সাবধানে পৌঁছতেই আমার প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লেগে গেল। মনে হল, যেন অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর কোনও পিন্ড নড়াচড়া করছে। ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে নদীর জলের গন্ধ নিয়ে, সেই গন্ধ, গ্রীষ্মবনের মাঝরাতের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

পা-পা করে এগোচ্ছি। পঞ্চাশ পা দূরে যখন গেছি, তখন দেখি, শুয়োর নয়; মস্তবড় একটা শজারু। শজারুর মুখটি ছিল আমারই দিকে। মুখটি অন্যদিকে ঘোরানো অবধি অপেক্ষা করে আর পঁচিশ-তিরিশ পা কতগুলো করৌঞ্জ আর কেলাউন্দা ঝোপের আড়ালে-আড়ালে এগিয়ে গেলাম গুঁড়ি মেরে। নিঃশব্দে পা ফেলে-ফেলে। তারপর কাছাকাছি পৌঁছে এক দৌড়ে গিয়ে তার ওপরে পড়লাম।

পড়তেই, আমাকে ঘাড়ে নিয়েই শজারুটা মুখ-থুবড়ে পড়েও ঘুরপাক খাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এরকম অদ্ভুত জানোয়ার আমি আগে দেখিনি। হয়তো দেখেছি, কিন্তু শিকার করিনি। মা-ও করেনি আমার সামনে। ওদের পিঠের ওপরে লম্বা-লম্বা অনেকগুলো সরু-সরু জিনিস শোয়ানো থাকে দেখেছি। সেগুলো যে হঠাৎ সোজা হয়ে গায়ে কাঁটা ফোটাবে, তা জানা ছিল না। তা ছাড়া সব জানোয়ারকেই আমরা ঘাড় কামড়ে এক ঝট্‌কাতে নীচে ফেলি। ফেলে, ঘাড়ে কামড়ে পড়ে থাকি। জানোয়ার যেই ধড়ফড়িয়ে উঠতে যায় অমনই তার ঘাড় যায় মট্‌কে। মেরুদন্ড থেকে ঘাড় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যদিও বাইরের চামড়া দেখে বোঝার উপায় থাকে না। তখনও ঘাড় চেপে ধরে থাকি। মরে গেলে, তারপরই দাঁত আলগা করি। আলগা করতেই রক্ত বেরোতে থাকে দাঁত যেখানে কামড়ে

বসেছিল, সেই ফুটো দিয়ে গলগল করে। তারপর ধীরেসুস্থে খাই। সুবিধেমতো জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখি আধ-খাওয়া মড়িটাকে পরদিন খাব বলে।

কিন্তু এই কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ারের ঘাড় খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। তাছাড়া জানোয়ারটারও প্রকান্ড। আমার গায়ে অসংখ্য কাঁটা একসঙ্গে বিঁধে যাওয়াতে আমি তাকে ছেড়ে দিতেই সে অধঃপতিত অবস্থা থেকে ঝটতি উঠে পড়ে পায়ে-পায়ে পিছু হটতে থাকলো আর ঝন্ঝন করে তার কাঁটাগুলো বাজতে লাগলো। আমারও জেদ চেপে গেল। আমরা ছোট হাতি ও বাইসন ধরে খাই, আর এ তো কোন্ ছার ঘাড়-খাটো ঠ্যাটা—জানোয়ার! মনে হচ্ছে, আমি বাচ্চা বলে আমাকে পাত্তাই দিতে চাচ্ছেনা। হুড়ুম্ করে আবারও তার গায়ে গিয়ে পড়তেই আবারও অনেকগুলো কাঁটা বিঁধে গেল। এবারে রাগের চোটে এলোপাথাড়ি দু'হাত দিয়ে থাপ্পড় চালাতেই সে তো ধরাশায়ী হল, কিন্তু দু'পায়ের থাবাতেও অনেকগুলো কাঁটা বিঁধে গেল। বিরাট বিরাট লম্বা কাঁটা, প্রায় মানুষদের পেন্সিল-এর মতো মোটা।

সে যখন ধড়্ফড়িয়ে যমরাজার কাছে যাচ্ছে আমি তখন আমার থাবা থেকে, গা থেকে, দাঁতের কামড় দিয়ে-দিয়ে কাঁটা তুলতেই ব্যস্ত। যে-সব জায়গাতে মুখ পৌঁছয় সেসব জায়গার কাঁটা তো তুললাম, কিন্তু যেখানে পৌঁছয় না সেখানের কাঁটা রয়ে গেল। বেশ কিছু কাঁটা, তোলবার সময়েই, শরীরের ভেতরে ভেঙে রয়ে গেল।

আগে দাঁত দিয়ে শজারুর কাঁটাগুলোকে একে-একে তার শরীর থেকে তুলে তারপর তাকে খেতে শুরু করলাম। বেশ খেতে। তবে মাংসতে একরকমের মাটি-মাটি গন্ধ। খরগোশের মাংসে যেরকম থাকে। শুয়োরও একই জিনিস খায় খাদ্য হিসেবে, কিন্তু শুয়োরের মাংস উপাদেয়। একটুও মাটি-মাটি গন্ধ নেই।

খেতে-খেতে সময়ের হুঁশ ছিল না। বড় জলপিপাসা পাচ্ছে। কিন্তু খোলা উপত্যকা পেরিয়ে টারা নদীর কাছে যাব কি না ভাবছি।

বাঘেদের রাজ্যের অলিখিত আইন, যে-আইন মায়ের কাছে শেখা; তা বড় কড়া। কখনও আমরা আড়াল-আবডাল ছাড়া এগোই না। যেহেতু আমরা আমাদের খাদ্যকে অনুসরণ করি গোপনে, লুকিয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে, এবং তাকে অনুসরণ করার পর কাছাকাছি গিয়ে অতর্কিতে পেছন থেকে বা পাশ থেকে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি, তাই যুগযুগান্ত ধরে বাঘেদের স্বভাবই হয়ে গেছে নিজেকে লুকিয়ে রাখা, অন্যের চোখ থেকে। এই কারণেই বন-পাহাড়ের মধ্যে যেসব গ্রাম আছে, সেই সব গ্রামের অনেক মানুষ সারাজীবন বনে বাস করেও বাঘ দেখেনি একবারও নিজের চোখে। অনেক শিকারী-মানুষও সারা জীবন বনে ঘুরেও এবারও বাঘ দেখেনি। দেখেনি, বন-বিভাগের অনেকেও।

আমরা নিজেরা শিকারী বলেই, যারা আমাদের শিকার করতে আসে সেই মানুষেরা আরও বেশি সাবধানী, আরও বেশি লুকিয়ে আসে তারা। তারা যে কোথায় কখন ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে বসে থাকবে তা অনেক সময়েই আগে থাকতে জানা যায় না। সেই কারণেই, যে জায়গাতে আড়াল নেই, ছায়া নেই; সেখান দিয়ে যাতায়াত করা আমাদের বারণ।

তবে এখন রাত।

এখনও রাত।

একটু পরেই পুবের আকাশে অন্ধকার পাতলা হতে আরম্ভ করবে। এখনও যেহেতু অন্ধকার আছে, ফিকে চাঁদের আলো থাকা সত্ত্বেও ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে টারা নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আবার এই আড়ালে ফিরে আসতে সময় বেশি লাগবে না।

যেখানে আমরা সাধারণত জল খাই সেই ঝরনাটি এখান থেকে অনেকই দূর, সেখানে গিয়ে পৌঁছতে- পৌঁছতে পূবের আকাশ লাল হয়ে যাবে।

এই ঠিক করে, আমি দ্রুত পায়ে হেঁটে চললাম টারা নদীর দিকে।

জঙ্গলে আমাদের ভয় করে সকলেই। আমাদের নিজেদের ভয় পাওয়ার মতো কিছুই এখানে নেই। এক, মানুষ ছাড়া। হাতির দল এবং বাইসনের দলকে আমরা এড়িয়ে চলি। ওরাও আমাদের এড়িয়ে চলে। তবে বাচ্চা-টাচ্চা ধরলে তারপর কোনোরকমে আমাদের তখন ওরা বাগে পেলে ঘিরে ফেলে চারদিক থেকে। তারপর শুঁড় দিয়ে, পা দিয়ে, শিং দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।

আরও একটি প্রাণীকে আমরা ভীষণ ভয় পাই। তা হচ্ছে শঙ্খচূড় সাপ। সব পাহাড়ে এরা থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানে হঠাৎ-হঠাৎ এরা বড় হাঙ্গামা বাধায়। বিরাট-বিরাট হয় এই সাপ এবং অত্যন্ত বদমেজাজি। মেজাজ খারাপ থাকলে বহুদূর থেকে তেড়ে এসে কামড়াতে চায়। অবশ্য আমাদের থাপ্পড়ে মারাও পড়ে অনেকে। আমাদের মতো তড়িৎগতি, সদা-সাবধানী জানোয়ার তো পৃথিবীতে বেশি নেই! তবু এরা আমাদের চেয়েও বেশি অতর্কিতে কখনও-কখনও আক্রমণ করে। তাই এদের কথা সব সময়েই মনে রাখতে হয়। তাছাড়া আরো নানা জাতের বিষধর সাপতো আছেই! তবে তারা নিজেরাও আমাদের ছেড়েই কথা বলে।

অনেকক্ষণ ধরে তৃপ্তি করে জল খেলাম। জল খাওয়ার সময়ে আমাদের জিভের আর জলের সংযোগে জোর চাক্-চাক্-চাক্-চাক্ শব্দ হয়। সেই শব্দে ভয় পেয়ে কতগুলো পাহাড়ি মাছ তড়বড়িয়ে উঠল। যেখানে নদীর পাশে নদীর জল জমে দহমতো হয়েছে, সেখানে। ক'টি ব্যাঙ জলের কিনারে-কিনারে জলছড়া দিয়ে লাফ মেরে-মেরে গোল বাধালো সেই শান্ত স্নিগ্ধ শেষ রাতে।

সন্ধ্যাতারাটা এবারে মুছে যাবে। আলো ফুটবে। তাই তাড়াতাড়ি ফেরার পথ

ধরলাম।

জল খেতে গিয়ে এবং এইটুকু হেঁটেই বুঝতে পারলাম যে, আমার চোয়ালের কাছে, গায়ে এবং পায়েও বেশ ক'টি শজারুর কাঁটা গভীরে ঢুকে ভেঙে গিয়ে ভেতরে রয়ে গেল।



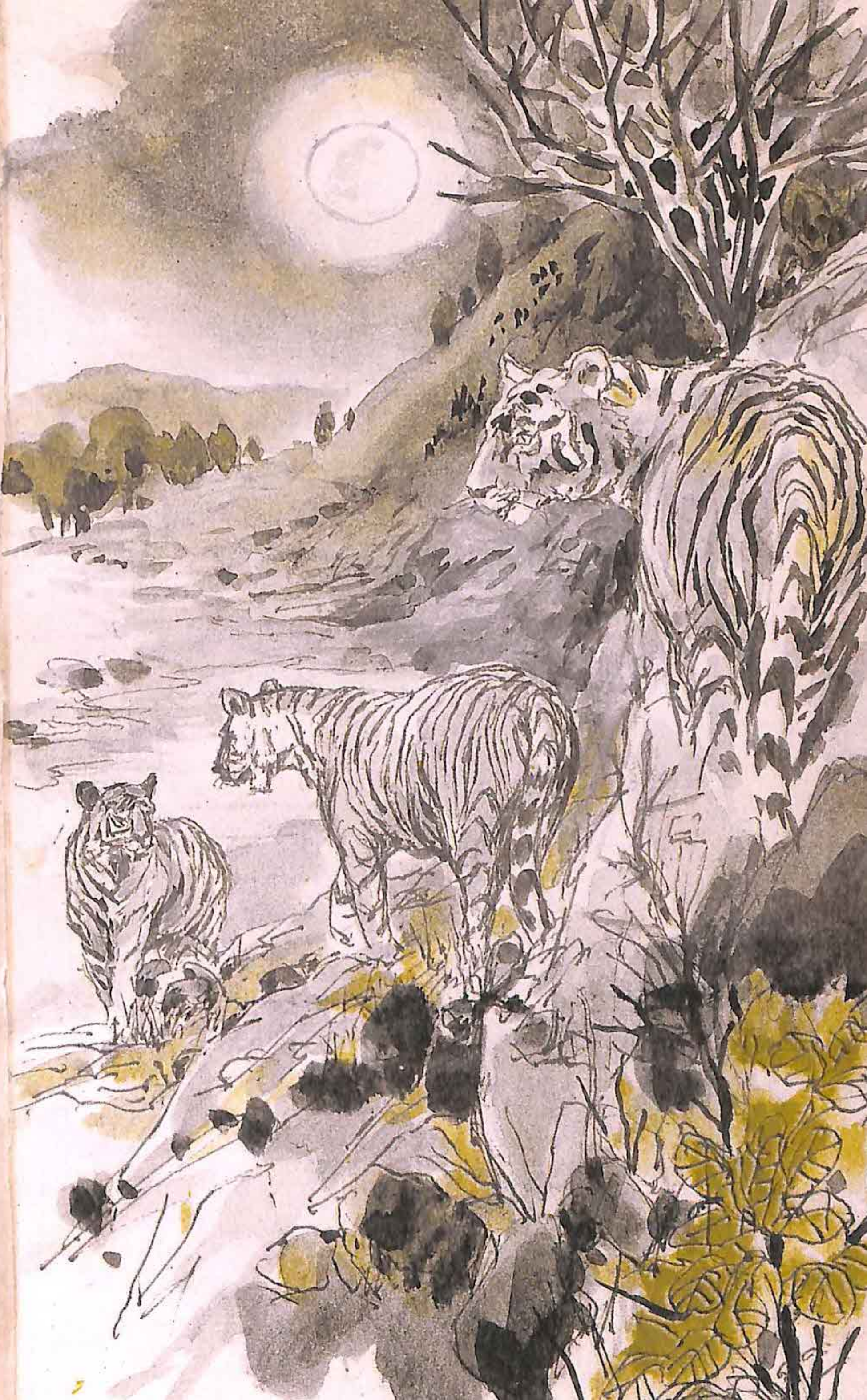
গরম এখন প্রচণ্ড। চারদিক খাঁ-খাঁ করে। জঙ্গল পাহাড় থেকে ধুঁয়ো ধুঁয়ো তাপ ওঠে। ভাপ। সাতসকালেই সূর্যের যা তাপ, মনে হয়, সব বুঝি পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। জঙ্গলে জলের উৎসও সব প্রায় শুকিয়েই গেছে। জল আছে শুধু টারা নদীতে। টারা নদী, যেখানে আমাদের ডেরার পাহাড়ের দিকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি বাঁক নিয়েছে সেইখানে জল খেতে যেতে হয়।

শুধু আমরাই নই, হাতি, বাইসন, শম্বর, চিতল হরিণ, শুয়োর, নীলগাই, শজারু,খরগোশ, চিতাবাঘ, হায়েনা, শিয়াল, বানর, হনুমান, ময়ূর, শকুন, মুরগি, তিতির, আস্‌কল, টিয়া, ধনেশ, বটের, হরিয়াল, রক-পিজিয়ন, নানারকমের সাপ, ইঁদুর, প্রজাপতি বিভিন্ন রঙা, সকলেই ওই টারা নদীরই বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের সুবিধেমতো জল খায়। লুকিয়ে জল খাওয়ার দরকার ওদের বিশেষ পড়ে না। তবে মাংসাশীরা লুকিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যের নদী থেকেই জল খায়।

সন্ধেবেলার জল তো না হয় খাওয়া যায়, মুশকিল হয়, শিকার ধরার পর গাদা-গাদা কাঁচা মাংস আর টাটকা রক্ত খেয়ে যখন প্রচণ্ড পিপাসা পায় তখন জল খাওয়া নিয়ে। শিকার তো আর বাঁধা থাকে না। কোন রাতে যে কতদূরে শিকার পাব তারও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কোনও-কোনও দিন দেড় দু'মাইল দূরেও শিকার হয়।

সেইজন্যই মা, আজকাল টারা নদীর কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করে। আমরাও তাই। কারণ আমাদের খাদ্য যেসব জানোয়ার, তারাও সকলে জল খেতে আসেই। হয় জল খাওয়ার সময়ে, নয় জলে যাওয়ার বা ফেরার সময়ে তাদের শিকার করি আমরা। কোনও রাতে নীলগাই, কোনওদিন শম্বর, কোনওদিন চিতল হরিণ বা অন্য কিছু। বড় জানোয়ার না পেলে কোনও-কোনও রাতে একাধিক জানোয়ার মারতে হয়। আমি আর মেজো, বোনটি; বড় হয়ে গেছি এখন। আমাদেরও প্রমাণ সাইজের বাঘের খাদ্য লাগে।

কিছুদিন হল মায়ের মেজাজ খুবই খারাপ। সবসময়ই খিটখিটে হয়ে আছে। আমাকে চড়, বোনটিকে থাপ্পড় মারছে কথায়-কথায়। হয়তো গরমের জন্যেও হতে পারে।কিন্তু গত বছর গরমের সময়ে তো এরকম হয়নি! কিছুতেই বুঝে



উঠতে পারছি না, কেন এমন মেজাজ হল মায়ের। বোনটিকেও দুপুরে এমন এক থাপ্পড় কষিয়েছিল যে, তার বাঁ কানের আধখানা ছিড়ে গেছে। দগ্‌দগে্ হয়ে আছে জায়গাটা।

একটু আগেই আমরা টারা নদীর সেই নিভৃত জায়গাতে এসেছি।

গতকাল একটি বড় পুরুষ নীলগাই মেরেছিলাম। তারই কিছুটা ছিল। তার কিছু খেয়ে নদীতে জল খেয়ে আমি চলে এসে পাহাড়ের একটি গুহার সামনের পাথরে বসে হাওয়া খাচ্ছি। মা আর বোনটি কোথায় জানি না। রাত শেষের আগে সকলেই আমাদের নালার গাছের ফোকরে ফিরে আসবে একে-একে। আমিও যাব।

এখন জঙ্গলের রূপ দারুণ। কিছু জায়গাতে ছাড়া প্রায় কোনও গাছেই পাতা নেই। পত্রশূন্য গাছেদের শাখা-প্রশাখা আকাশের পটভূমিতে কেমন এক হিজিবিজি ছবির সৃষ্টি করেছে। পাথরে, মাটিতে, গাছের ডালে, সারাদিনের প্রখর তাপ জমা হয়ে থাকে। মাঝরাতের আগে পৃথিবী ঠান্ডা হয় না এখন। গরমের হল্‌কা থাকে হাওয়ায়। দূরের পাহাড়ে-পাহাড়ে জঙ্গলের আগুন, মালার মতো ঘিরে রয়েছে জঙ্গলকে। হাওয়া সেদিকে ছুটে যাচ্ছে। উলটো দিকের হাওয়া যখন দাবানল পেরিয়ে এদিকে আসে তখন হাওয়াটা এত গরম লাগে যে, মনে হয় গায়ে ছ্যাঁকা লেগে যাবে। গায়ের লোম পুড়ে যাবে বলে মনে হয়।

আজ পূর্ণিমা।

একটি হলুদ থালার মতো চাঁদ এলেবেলে পাতাঝরা গাছেদের কালো শিল্যুটের হিজিবিজি বারণ না শুনে দিগন্তরেখা বেয়ে ধীরে-ধীরে ওপরে উঠেছে। প্রথমে টারা পাহাড়ের কাছিম-পেঠা পিঠটা টপ্‌কেছে, তারপর তার পিঠের ওপরের রোঁয়া-রোঁয়া জঙ্গলও। এখন সবকিছুই টপ্‌কে উঠে মাঝ-আকাশে ফুটে আছে আলোর ঝরনার উৎস হয়ে। বন-পাহাড়, গাছ; তাদের শাখা-প্রশাখা, পাথর, নদী সবই যেন এই গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্যে এক হঠাৎ স্নিগ্ধতা পেয়েছে। দূরে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ছড়িয়ে যাওয়া লাল আগুনের মালা, মাথার ওপরের হলুদ চাঁদ আর কালো জঙ্গল পাহাড়, গাছগাছালি, মিলেমিশে এক অদ্ভুত ছবির সৃষ্টি করেছে।

বাঘ হয়ে জন্মেছি বলে মাঝে মাঝেই সৃষ্টিকর্তার কাছে বড় কৃতজ্ঞ বোধ করি। আমরাও এক ধরণের সন্নিসী। নিজের বেঁচে থাকার জন্যে খাবার আর পানীয় জল ছাড়া বিধাতার কাছে আর বিশেষ কোনো চাহিদা বা ভিক্ষাও নেই। তাও নিজের খাবারটা নিজেই সংগ্রহ করে নিই আমরা। কিন্তু এই রূপ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রস-ভরা অরণ্য প্রান্তর পাহাড়ের এক ধরনের মালিকানাও যেন আমাদের উপরই বর্তে গেছে। এই পাহাড়ের চুড়োর পাথরে বসে আমি দিন শেষে বা রাত শেষে যখন তাকাই আমার আদিগন্ত সাম্রাজ্যের দিকে তখন

আশ্চর্য এক বোধ আমাকে ছেয়ে ফেলে। মনে হয়, এর চেয়ে বেশি বা বড় পাওয়া আর কীইবা ছিলো! বা হতে পারে!

মুগ্ধ হয়ে বসে ছিলাম আমি পাথরে। গরমের জন্য দুপুরে ঘুমটুম বিশেষ হয়নি। এখন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে।

হঠাৎ টারা পাহাড়ের ওপর থেকে উঁ-উ-উ-আঁও, উঁ-উ-উ-আঁও, উঁ-উ-উ-আঁও করে তিনবার একটি বাঘ ডেকে উঠল। বড় বাঘ!

আমি তড়াক্ করে উঠে বসলাম। আমাদের এলাকাতে অন্য বাঘ ঢোকে! সাহস তো কম নয়।

বাঘটা বারবার ডাকতে লাগল। মা এখন কোথায়, কে জানে! মাকে খুঁজে নিয়ে মায়ের সঙ্গে যুক্তি করে একসঙ্গে গিয়ে লড়াইতে নামতে হয়। বাঘ হয়ে জন্মেছি তাই আমার অভিধানে "ভয়" বলে কোনও শব্দ ছিল না। লড়াই আমি একাই করতে পারি, তাতে মরে গেলেও ক্ষতি নেই। এখন আমাদের পরিবারে তো আমিই একমাত্র পুরুষ। আমিই লড়বো। একাই। বাঘেরা দল পাকাতে জানে না কুকুরদের মতো। গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যারা থাকে তারা কোনওদিন বাঘ হতে পারবে না। গলার আওয়াজ যেমন গমগম করছে, পাহাড়ে-পাহাড়ে তার ডাকের যেমন প্রতিধ্বনি উঠছে তাতে বাঘটা যে পুরুষ এবং বেশ বড় বাঘ, সে-বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই আমার।

মা কোথায়, খুঁজে বের করার জন্য পাথরটা ছেড়ে নামতে যাচ্ছি এমন সময় হঠাৎ শুনলাম যে, মা ওই বাঘেরই ডাকের উত্তর দিল। ওই বাঘের ডাক, বা মায়ের ডাকটিও একেবারেই নতুন রকমের। এই রকম ডাক, বাঘ বা বাঘিনীর মুখে আগে কখনওই শুনিনি।

একটুপরে মাকে দেখাও গেল।

আমাদের পাহাড়ের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে, টারা পাহাড়ের দিকে মুখ করে মা নবাগন্তুক বাঘের ডাকের উত্তর দিচ্ছিল। বাঘটা ডাকতে-ডাকতে টারা পাহাড় থেকে নেমে আমাদের পাহাড়ের দিকে আসছিল।

মাও দেখলাম, আমাদের পাহাড় থেকে নেমে টারা পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছে।

আমি বোনটির সাড়াশব্দ না পেয়ে দৌড়ে মায়ের কাছে নেমে গেলাম। কিন্তু মা আমাকে দেখতে পেয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত হিংস্রভাবে দাঁত বের করে মা আমাকে সাবধান করল। কাছে যেতে বা তাকে বিরক্ত করতে মানা করলো।

কিসের যে সাবধানতা তো বুঝতে না পেরে আমি মায়ের আরও কাছে যেতেই মা আমাকে ভীষণ জোরে থাপ্পড় মারল। এতই জোরে মারল এবং আমার এতই লাগল যে, আমি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অনেকখানি গড়িয়েই গেলাম।

হতভম্ব হয়ে উঠে বসে দেখি আমার ডান কাঁধের কাছ থেকে এক খাবলা

মাংস উঠে গেছে এবং রক্তে আমার শরীর ভেসে যাচ্ছে।

আমি ওইখানেই অবাক হয়ে বসে বসে দেখলাম যে, আমার জন্মদাত্রী মা আমাদের পাহাড় থেকে নেমে গেল এবং টারা পাহাড়ের গা বেয়ে বড় বাঘটা টারা নদীর বালি আর সামান্য জল পেরিয়ে এসে খোলা প্রান্তরে দাঁড়াল যেন মায়েরই প্রতীক্ষায়। বাঘিনী আর বাঘ দু'জনে একসঙ্গে হতেই দু'জনের মধ্যে যে সাঙ্ঘাতিক লড়াই হবে বলে আশঙ্কা করছিলাম তা হল না। মা ওই বাঘটার সঙ্গে উপত্যকার হিজিবিজি জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

সেই রাত-শেষে আমাদের ডেরায় ফিরে দেখলাম, বোনটিও ফেরেনি।

সেও সম্ভবত আমারই মতো ওই বাঘের প্রচণ্ড ডাকাডাকি, মায়ের উত্তর দেওয়া এবং দু'জনের একসঙ্গে চলে যাওয়া দেখেছিল।

আমাদের বাঘের মন আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে, সামান্য দিনের পারিবারিক জীবন আমাদের শেষ হয়ে গেলো। প্রত্যেক বাঘ এবং বাঘিনীই একা। জন্মের পর যতদিন না স্বাবলম্বী হয়ে উঠি ততদিনই মা কাছে-কাছে ছিল। প্রত্যেক বাঘ এবং বাঘিনী তার নিজস্বতা এবং স্বাতন্ত্র্যকে ভীষণই ভালবাসে। কোনও কিছুর জন্যই তা তারা বাঁধা দিতে রাজি নয়।

আমার একার জীবন শুরু হল। পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় বনের সবচেয়ে রহস্যময় পশু; বাঘের জীবন।



বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে।

প্রথম কয়েকদিন মনটা খারাপ লাগত খুবই। একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে শোওয়া। দিনের ও রাতের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে প্রায় আঠারো ঘন্টাই একসঙ্গে থাকতাম আমরা। একসঙ্গে খেলা।

মা ও বোনটি চলে যাওয়ার পর শুধু একরাতই আমি ওই গাছের ফোকরে ছিলাম। তারপর ওই জায়গাতে থাকতে আর ভাল লাগল না।

পরদিন রাতেই টারা পাহাড়ে গেলাম নদী পেরিয়ে, মনোমতো নতুন আস্তানার খোঁজ করতে। অনেক খুঁজেপেতে মনোমতো একটা গুহাও পেলাম। গুহাটা বেশি গভীর নয়। কিন্তু আমাদের পুরনো গুহারই মতো অন্য একটি মুখ ছিল তার। মাথার ওপরে এক জায়গাতে ফাঁকফোকর ছিল। এবং সেখানেও ছিল গাছের চাঁদোয়া।

মিট্‌কুনিয়া, সাহাজ, কস্‌সি এইসব গাছে টারা পাহাড় ভরা ছিল। নীচের দিকে ছিল সেগুনের জঙ্গল। গুহার মধ্যে জায়গা বেশি না থাকলেও, আমার একার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। গুহার ঠিক মুখে একটি সাদা পাথরের মস্ত চাঙড় ছিল। গ্র্যানাইট। যেখানে বসে নীচের নদী, প্রান্তর, উপত্যকা এবং আমরা এতদিন যে-পাহাড়ে ছিলাম তারও অনেকখানিই চোখে পড়ে। সন্ধের সময় এখানে বসে-বসেই জানোয়ারদের রাহান-সাহান-এর খোঁজ করা যাবে। তারপর ধীরেসুস্থে নেমে গেলেই হবে। নীচে, টারা নদীর একটি দহতে জলও ছিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে সন্ধেবেলা যেখানে জল খেয়ে তারপর টহলে বেরোতে অসুবিধে নেই। নদীতে জল তো ছিলই।

মনটা ভাল ছিল না। তাই খিদে পেলেও সে রাতে কোনও শিকার করলাম না। শিকার অবশ্য কিছু চোখেও পড়েনি।

নিচের উপত্যকার একটি গাছে ছোট-ছোট বানরের আস্তানা ছিল। কয়েকশো বানর ছিল সেই গাছে। কোনও কিছুই শিকার যেদিন হত না অথচ পেটে খিদে থাকত, তখন মা এরকম বানর-ভরা গাছের নীচে গিয়ে মুখ ওপরে তুলে গর্জন করত। এবং সেই গর্জনেই তিন-চারটে বানর ভয় পেয়ে হাতের ডাল ফসকে

নীচে পড়ে যেত। মানুষেরা যেমন ঝড়ে-পড়া আম বা অন্য ফল কুড়িয়ে খায়, আমরা তিন ভাইবোন তেমনই বানর কুড়োতাম। লাল বানরগুলোর মাংস খেতে বেশ। শম্বর, নীলগাই-এর মাংস খেয়ে-খেয়ে মুখে অরুচি ধরলে ওই লাল বানরদের মাংস বেশ আচারের মতো লাগত।

ঠিক করলাম, কাল সূর্য ওঠার আগেই ওই গাছতলায় গিয়ে গর্জন করে দু-একটা বানরকে ওপর থেকে ধরাশায়ী করে সকালের প্রাতরাশ সেরে নদীর দহতে জল খেয়ে এসে নতুন বাড়িতে ঘুমোব।

গুহাটার সবই ভাল, শুধু কেমন বিটকেল গন্ধ ছাড়ছে একটা। অন্য কোনও জানোয়ারের বাস ছিল কি?

ভাবলাম, যে-জানোয়ারের বাসই থাকুক, বাঘ সে-বাসার জবরদখল নিলে কোনও জানোয়ারের সাহস হবে না যে ফিরে এসে সে-বাসার মালিকানা দাবি করে! অবশ্য গোঁয়ার-গোবিন্দ ভালুকদের কথা বলা যায় না। তাদের প্রত্যেকেই এক একটি চিজ।

সকাল হতেই সেই বানর-ঝোলা গাছের নীচে গিয়ে গর্জন করব ভাবছি এমন সময়ে দেখি বানরগুলোই প্রচণ্ড চেঁচামিচি করতে-করতে ঝুরি ধরে ঝুলে-ঝুলে অন্য গাছে চলে যেতে লাগল। বাচ্চা-কাচ্চা ধাড়ি-মরদদের চিৎকার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। ওপরে চেয়ে দেখি, একটি ছোট চিতা সেই গাছে গিয়ে উঠেছে বানর খাওয়ার লোভে। চিতাটা খুবই ছোট। হয়তো মাকে সবে ছেড়েছে আমারই মতো। আমি মুখ তুলে প্রচণ্ড গর্জন করতেই দুটি বানর-বাচ্চা চিঁ চিঁ করতে করতে মায়েদের বুক থেকে খসে পড়ল এবং তারই সঙ্গে সেই চিতাবাঘটাও। আমি বানর ছানা ছেড়ে চিতার টুঁটি কামড়ে ধড়লাম। কিছুক্ষণ ফ্যাস-ফ্যাস করল বটে, কিন্তু তার ঘাড়ে আমার দাঁত বসে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছিল। সে শান্ত হয়ে এলে তাকে নিয়ে জলের দহর পাশের গিলিরি ও মুতুরি লতার ঝোপের মধ্যে গিয়ে ধীরে সুস্থে খেলাম। মাংসটা একটু শক্ত বটে, তবে খেতে মন্দ নয়। মাথাটা আর খেলাম না। চোখ দুটো আর নাকের কিছুটা খেয়ে মুণ্ডুটা ছেড়ে দিলাম। লেজটা খেতে বেশ লাগল কচ্‌কচ্‌ করে।

একবার মা একটা কচ্ছপ ধরেছিল বড় নদীর একটি খাঁড়িতে। কচ্ছপের পিঠের কচ্‌কচে ঢাকনাটা খেতে যেমন লাগে চিতাবাঘের লেজটা খেতেও তেমনই লাগল। চারটে থাবা থেকে পায়ের নরম মাংস কুরে কুরে খেলাম বটে, কিন্তু নখগুলো সাবধানে এড়িয়ে গেলাম। যদিও হরিণ-টরিন অনেক সময় খুরসুদ্ধু খেয়ে ফেলি, কিন্তু চিতার বাঁকা-বাঁকা ধারালো নখ খাওয়ার সাহস হল না।



আজ সকাল থেকেই গরম প্রচণ্ড। আজকে বোধ হয় দুপুরে পাহাড়ে আর থাকা যাবে না। এই জলে এসেই বসতে হবে। এমনিতে কিন্তু জল আমাদের মোটেই পছন্দের জিনিস নয়। বেড়ালের জাত তো! গায়ে জল পড়লেই আমাদের চোর বা ভিখিরির মতো দেখায়; লোমগুলো লেপ্টে যায়। তাই বর্ষাকালে বৃষ্টির সময়ে আমরা মাথা-গা বাঁচিয়ে কোথাও বসে থাকি। রাতে যখন বের হই, তখনও বনের মধ্যের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চওড়া রাস্তা দিয়ে হাঁটি, যাতে গাছ-পাতা থেকে বৃষ্টির জমা জল টুপ্‌টুপিয়ে আমাদের গায়ে না পড়ে।শীতের শেষ রাতেও অমনই হাঁটি বনপথ দিয়ে। কারণ, গাছ-পাতায় জমে-থাকা শিশির শেষ রাতে বৃষ্টির জলের মতোই পড়ে টুপ্‌টুপিয়ে।

চিতার ভোজ খেয়ে পেট ভরে জল খেয়ে গুহাতে গিয়ে ঘুম লাগালাম একটা। বেলা দশটা-এগারোটা হবে। হঠাৎই হাজার পাখির চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। সাবধানে গুহার বাইরে এসে দেখি আমার গুহার ঠিক সামনেই একটি প্রাচীন মহানিম গাছের ফোকরের মধ্যের পাখির বাসাতে হানা দিয়েছে একটি বড় কেউটে। কুচকুচে কালো তার গায়ের রঙ। পাখির বাচ্চা খাওয়ার জন্য। তার নীচের ফোকরে অন্য কোনও পাখির বাসায় পাখির ডিমও ছিল। ডিমগুলো আগে খাওয়ার পর বাচ্চা ধরার জন্য ওপরের ফোকরে সে তখন মাথাটা ঢুকিয়েছে। আর লেজটা বাইরে আছে। সাপটার চারধারে নানা পাখি উড়ছে নানা গাছের ডালে বসছে আর গলাফাটানো চিৎকার করছে।

আমার কিছুই করার নেই। প্রকৃতির রাজ্যে এই নিয়ম। এর মধ্যে কোনো বীভৎসতা বা অন্যায়ও কিছু নেই। করুণা ও অনুকম্পারও কিছুমাত্র নেই।

মানুষ, যদি তার আকাশ ছোঁয়া লোভে আর সবজান্তা হওয়ার দোষে এমন করে প্রকৃতির এই স্বাভাবিক ব্যাপার স্যাপার, যাকে মানুষদের খবরের কাগজের ভাষায় বলে 'ভারসাম্য' তা এমনি করে নষ্ট না করতো তবে এই পৃথিবী আজকে আমি, এই মিস্টার বাঘের কাছে যতখানি সুন্দর থাকতো, মিস্টার সাপ, মিস্টার পাখি এবং মিস্টার মানুষের কাছেও ঠিক ততখানিই সুন্দর থাকতো।

কিন্তু মানুষেরা সে কথা বুঝলো না!

বাঘের খাদ্য তৃণভোজী জানোয়ারেরা। তাদের খাদ্য ক্লোরোফিল উজ্জ্বল গাছ-পাতা, শাক-সবজি , নানারকম মূল, যেমন কচু, বুনো আলু, বুনো ওল, কান্দা, গেঁঠি, শটি। মানুষের ক্ষেতে-করা নানারকম ফসল, যেমন কুলথী বা

কলাই বা বিরি ডাল, বাজরা, গম, জিনৌর, মকাই বা ভুট্টা, চানা বা ছোলা, আখ বা কিতারি বা গিন্না; কড়াইশুঁটি বা মটরছিম্মি। কাঁঠাল বা পনস, পেয়ারা বা আমরুদ, আমলকী বা আমলা, অথবা আম ইত্যাদি। চিনা বাদাম, কড়াইশুঁটি বা মটরছিম্মি এসব খায় ভালবেসে, খরগোশেরা। বীট, গাজর, লেটুস, কপি, যা পায় তাই খায়। শুয়োরেরা, ভাল্লুকেরা, শজারুরাও মূল খায়। তৃণভোজী সবাই ফলও খায়। পাখিরা ওসব ছাড়াও খায় পোকামাকড়। পাখিদের খায় সাপ, বাজপাখি, ছোটবাঘ, শেয়াল; হায়না।

এইরকমই একে অন্যের খাদ্য। খাদ্য ও খাদকের সম্পর্ক নেহাৎ মোটা দাগেরই সম্পর্ক। হরিণ বেশি থাকলে বুনো কুকুরেরা এসে তাদের খায়। কুকুরদের তাড়া খেয়ে যে বনে হরিণ কম হরিণেরা সেই বনের দিকে পালায়। এমনি করে ভারসাম্য রক্ষা হয়। তাই দোষটা সাপেদের বা আমাদের নয়। দোষটা পুরোপুরি মানুষের।

এমন কিন্তু ছিল না আগে। যখন লালমুখো ভুস-ভুস করে পাইপ থেকে ধোঁয়া ছাড়া মানুষগুলো এখানে ছিল। এটা, মায়ের নিজেরও কথা। আসলে মায়ের নিজেরও শোনা কথা। কথাটা মায়ের দিদিমারও হতে পারে। মুখে মুখে যা শুনেছে তাই মা বলত। তখন জঙ্গলে কাঠ কাটা হত আইন মেনে, শিকার করা হত আইন মেনে। বড়লোক গরিবলোক সকলেরই আগে ভয়-ডর ছিল। আইন অমান্য করলে যে শাস্তি পেতে হবে একথা সকলেই জানত। এই দেশটা "স্বাধীন" হয়ে যেতেই সব মানুষই পুরোপুরি "স্বাধীন" হয়ে গেল। সে জিপে-চড়া শিকারীই হোক কি ফরেস্ট-গার্ডই হোক, কী ফরেস্ট কনসার্ভেটরই হোক, কী গাঁয়ের গাদা-বন্দুক হাতের শিকারীই হোক।

এই ধরনের "স্বাধীনতার" মতো অবাধ বিপজ্জনক ব্যাপার যত কম থাকে ততই মিস্টার সাপ, মিস্টার বাঘ, এবং মিস্টার মানুষের পক্ষে মঙ্গলের।

সন্ধে হওয়ার আগেই সাদা পাথরটার চাঙড়ে এসে বসলাম। দুপুরের অসহ্য গরমের পর নীচের উপত্যকা থেকে মরুভূমির মতো তাপ উঠছে। ঝাঁঝ। পোড়ামাটির গন্ধ। উপত্যকার কোনও জায়গাতে চোখের ভুলে মনে হচ্ছে জল জমে আছে যেন। মানুষেরা একে বলে, লালমুখো মানুষদের ভাষায়; "অপটিকাল ইল্যুশান্"। একদল হাতি ধীরেসুস্থে জলে আসছে, আমরা আগে যে পাহাড়ের নীচে ছিলাম সেই পাহাড়ের এবং অন্য একটি পাহাড়ের মধ্যের খোল থেকে। এই দলে বড় দাঁতাল আছে একটা। ছোট দাঁতাল একটা। মাকনা দুটো। মাদি হাতি, গোটাসাতেক। আর দুটি গুল্লু-গাল্লু সুন্টুনি-মন্টুনি বাচ্চা। ওরা জলে এল জল খেলতে, জল খেতে, চান করতে। শুঁড় দিয়ে জল তুলে -তুলে হোসপাইপের মতো এ ওর গায়ে দিয়ে-দিয়ে খেলতে লাগল। বাচ্চা দুটো জলের মধ্যে হাঁটতে গিয়ে আছাড় খেল বারকয়েক। তাদের মায়েরা শুঁড়ের ঠেলা দিয়ে-দিয়ে আর

শুঁড়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে তাদের তুলে দিল।

এই হাতির দলটা নতুন এসেছে। তিন-চারদিন আগেও এখানে ছিল না। যেখানে ছিল সেখানে বোধ হয় জলকষ্ট খুব। জলের জন্য এখন টারা নদীর কাছে সন্ধের আগে থেকে শেষরাত অবধি কত তৃণভোজী এবং মাংসাশী জানোয়ার আর পাখিই যে ভিড় করে, তা বলার নয়। সন্ধে নামার পর থেকেই তাদের ডাকে নদী পার সরগরম হয়ে থাকে। ছোট জানোয়ারদের শেয়াল, হায়েনারা ধরার তালে থাকে। তার চেয়ে বড় জানোয়ারদের চিতা। আরও বড় জানোয়ারদের, বাঘ। বাঘ বলতে এখন আমি একা। এখানে।

এখন মা নয়, আমি একাই এই রাজ্যের মালিক। এই বনের রাজা। সূর্য ডোবার ঠিক আগে আমি কখনও ঘুম ভেঙে উঠে এই পাথরে আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে বার দু-তিন-চার ডনবৈঠকি মারার পর যখন হুঁআউ করে ডাকি তখন সমস্ত বন-পাহাড়ের অন্য সব প্রাণী নিশ্চুপ হয়ে গিয়ে আমাকে সম্মান জানায়। স্বীকার করে যে, আমিই অধীশ্বর। ট্যা-ট্যা করে ডাকতে-ডাকতে উড়ে যাওয়া টিয়ার ঝাঁক হঠাৎ চুপ করে যায়। পাহাড়ের ওপরে কাঠঠোকরা ঠক-ঠক করছিল হয়তো এতক্ষণ আর তার দোসর সাড়া দিচ্ছিল নীচ থেকে। তারাও হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। হাজার পাখি, বানর, হনুমান সকলের কলকাকলি ও মিলিত কণ্ঠের শব্দ একেবারে নিথর হয়ে যায়। আমার ডাকের পর কিছুক্ষণ থির-নিস্তব্ধ থাকার পর পাহাড় ও বনস্থলী আবার জেগে ওঠে। নদীর কাছ থেকে একটা কোট্‌রা ভয়-পাওয়া ডাক ডেকে ওঠে ব্বাক্-ব্বাক্। শম্বর ডাকে, ঢাংক্-ঢাংক্। আবার বনের শিরা-ধমনীতে রক্ত-চলাচল শুরু হয়, প্রাণ ফিরে আসে।

আমিও পাথর ছেড়ে নেমে নিচে যাই। আড়াল থেকে আড়ালে, ছায়া থেকে ছায়ায়; ছায়ার চেয়েও বেশি ছায়া হয়ে রাতের প্রবল অন্ধকারে অন্ধকারের মতো মিশে যাই। যমদূত হয়ে পিছু নিই জীবনের। রোজ রাতে।

এই গ্রীষ্মবনের রুক্ষতার মতো দুর্মর রুক্ষতাতে ঝল্‌সে গিয়ে বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয় যে, এই বনে আবার কোনওদিন নতুন পাতা আসবে। কিশলয়। শিরীষ গাছে আর সাদা মসৃণ ধবধবে গেণ্ডুলি গাছে-গাছে নতুন পাতা এসে লাল ফুলের মতো ভরে দেবে দিগ্বিদিক। পাতায়-পাতায়, ফুলে-ফুলে ভরে যাবে জঙ্গল-পাহাড় আবারও। পাতার আড়ালে হারিয়ে যাবে এক গাছ অন্য গাছের কাছ থেকে। এই গরমের রুক্ষ দিনে বনকে অগণ্য কিন্তু স্বতন্ত্র আলাদা আলাদা গাছের সমষ্টি বলে চেনা যায়। আর ঘনঘোর বর্ষাতে মনে হবে সবুজ জনতা। একক সত্তা, কিছু-কিছু গাছ ছাড়া; যেমন শিমুল, আর কারওই থাকবে না।

গাছেরা জন্মাবধি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু গাছেরা না-হেঁটে ঊর্ধ্ববাহু সন্নিসিদের মতো দূরে-দূরে হেঁটে যায়। গ্রীষ্মের বনের দিকে মনোযোগের সঙ্গে চাইলে এই সন্নিসিদের চেনা যায়। প্রখর গ্রীষ্মে, বনের বুকের

কোরকের দগ্‌দগে ঘায়ের মতো ফুটে থাকে পলাশ, শিমুল; ক্বচিৎ কৃষ্ণচূড়া।

কোনও-কোনও বনের অংশ হলুদ হয়ে যায় অমলতাসের ভিড়ে। কোথাও বা কিশোরীর স্বপ্নের রঙের মতো ফিকে বেগুনিরঙা হয়ে যায় বন, জ্যাকারান্ডা গাছেদের ভিড়ে। সেই ফুল ফোটার দিনের পরে আসে এই অন্তবিহীন রুক্ষতা, ঝাঁঝ, জ্বালা; তাপ। পাখি বলে, বীজ বলে, হরিণ বলে; বনের প্রতিটি গাছের শাখাপ্রশাখায় সুপ্ত-থাকা প্রাণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কবে যে বৃষ্টি নামবে! বাতাসও তখন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে; কবে যে নামবে বৃষ্টি!



সেদিন হাতির বাচ্চা দুটোকে দেখে বড় লোভ হয়েছিল। মায়ের সঙ্গে থাকার সময়ে খেয়েছিলাম। মা ও বোনটি চলে গেছে তা তো বেশ কিছুদিন হয়ে গেল।

কাল রাতে কিছুই শিকার হয়নি । পরশু রাতেও নয়। ওই লোভ। দু'রাত্তির হাতির দলের পেছন পেছন ঘুরঘুর করেছি। তিন-চারবার হাতিরা টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বড় দাঁতালটা পাহাড়ের মতো। মাথার দু'পাশে দু'কান লেপ্টে টাটা ট্রাকের হর্নের মতো আওয়াজ করে তেড়ে এসেছিল। কোনওক্রমে পালিয়ে বাঁচি।

কিন্তু লোভ তো ছাড়ে না। গায়ের গন্ধের মতো লেগে থাকে সঙ্গে-সঙ্গে। জেদ যখন ধরেছি তখন দুটোর মধ্যে একটা বাচ্চা ধরবই ধরব। এখন ক'দিনে পারি, দেখি।

তারপর? হাতিরা যদি পিষে দেয়?

নিজেই নিজেকে বলি।

তারপর বলি, দিলে দেবে। হাতির বাচ্চা খেতে গিয়ে মরেও সুখ।

সন্ধের একটু আগে টারা পাহাড়ের মাথার ওপরের মালভূমিতে রোঁদে বেরিয়েছিলাম। তার আগে নীচে নেমে জল খেয়ে নিয়েছি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা রাস্তা গেছে পাহাড়ের মাথা ঘুরে-ঘুরে। এ পাহাড় থেকে নেমে পাশের পাহাড়ে উঠে গেছে লাল মাটির রাস্তাটা। সেখানে একটা দু'কামরার বাংলো আছে। সাদা রঙের। লাল টালির ছাদ। চাঁদনি রাতে ফুটফুট করে বাংলোটা। ওইখানে মাঝে-মাঝে শিকারীরা এসে ওঠে। অনেক সময় মেয়েদেরও নিয়ে বেড়াতে আসে। পিক্‌নিক্ করে চলে যায়।

বনের ওই রাস্তাটার কাছে দিনে-রাতে সব সময়ই আমার ভয়। কারণ জিপ যায় মাঝে-মাঝেই। ট্রাকও যায়। অথচ ওই রাস্তাটা না-পেরোলেই নয়। কারণ ওই রাস্তার ওপারে ওই পাহাড় পেরিয়ে যে উপত্যকা, তাতে জানোয়ার একেবারে থিক্‌থিক্ করে। গেলেই শিকার। কষ্ট নেই কোনও।

মানুষদের বাঘের ভয়। আর বাঘেদের মানুষদের ভয়।

আজ অন্ধকার হওয়ার ঠিক আগে-আগেই ওই রাস্তাটার কাছে গিয়ে

পৌঁছলাম। রাস্তাটা একটি জায়গায় টিলার পাশ ঘেঁষে গেছে। টিলাটার ওপরে অনেকগুলো কালো কালো ব্যাসাল্ট পাথর, না কি কোয়ার্টজাইট্। পাথরের স্তূপ।

যখন এদিকে আসি তখন রোজই আমি ওই জায়াগাটাতে আগে গিয়ে পৌঁছই, যথাসম্ভব আড়াল নিয়ে। তারপর টিলাটার উপরে উঠে ওই পাথরগুলোর স্তূপের মধ্যে গিয়ে বসি। বসে, পাথরের আড়াল থেকে পথের দু'দিকটা খুব ভাল করে দেখে নিই। কান খাড়া করে শব্দ শোনার চেষ্টা করি। সম্পূর্ণ নিরাপদ বুঝলেই তখন একলাফে নীচে নেমে পথটা যথাসম্ভব কম সময়ে পেরিয়ে গিয়ে আবার পাথরের, গাছের গুঁড়ির আড়ালে পৌঁছে; আড়ালে আড়ালেই উপত্যকাতে নেমে যাই।

শিকার ধরে, তা খেয়ে এবং জলও খেয়ে যখন ফিরি, তখন শেষরাত। তখন যদি গাড়ির আলো দেখি পথে, তো বুঝি; শিকারীর গাড়ি। এমনিতেই ড্রাইভারেরা হাতি ও বাঘ এদিকে দেখা যায় বলে এইপথে রাতে সাধারণত চলাচল করে না। বেশি রাতে শিকারীরাই আসে।

সেদিন তখনও পশ্চিমাকাশে আলোর আভা ছিল; যখন পাথরের আড়াল থেকে লাফিয়ে নেমে আমি লাল মাটির রাস্তাটা পেরোলাম। গ্রীষ্মকালে জঙ্গলের নীচে ঝোপঝাড় খুবই কম থাকে বলে এবং গাছেও পাতা থাকে না বলে, সূর্য ডোবার পরও অনেকক্ষণ অবধি জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে নজর চলে। বর্ষাকালে ও শীতকালে ঝোপঝাড় ও ঘন পাতার আস্তরণের জন্য মনে হয় ঝুপ্ করে সন্ধে নেমে এল।

ঝিঁঝি ডাকছিল। এই ঝিঁঝিগুলো অন্য ঝিঁঝি। ভরদুপুরে যারা হাজার-হাজার করতাল বাজানোর মতো করে ডাকে, তারা নয়। একটি কুটুরে, গেছো ব্যাঙ, কট্‌কট্ করে ডেকে উঠল ন্যাড়া গাছ থেকে। পাতা ঝরে গেছে বলেই হয়তো গাছটাকে চিনতে পারলাম না।

আরও একটু এগিয়েছি, এবারে উপত্যকায় নামব বলে; এমন সময় হঠাৎ কানে এল একটা অদ্ভুত শব্দ। মনে হল, মানুষদের একটা এরোপ্লেনই বুঝি এক জায়গায় থেমে শব্দ করছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে। মানুষদের এরোপ্লেন রাতের বেলা রোজই একটা সময়ে এই পাহাড়ের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। সার-সার আলো জ্বলে দু'পাশের জানালায়। দুটি ডানার আলো, নেভে আর জ্বলে। লেজেও আলো আছে। যে-সব মানুষ আলো-জ্বালা জানালার পাশে বসে নীচের অন্ধকারে চেয়ে থাকে তারা জানেও না যে, তাদের এরোপ্লেনকে আমি রোজ দেখি। সূর্য ডোবার ঘন্টাখানেক পরেই উড়ে যায় প্লেনটা, পুব থেকে পশ্চিমে।

কিন্তু ওই শব্দটা এক জায়গা থেকেই হচ্ছে। শব্দটার নড়াচড়া নেই। এটা মানুষদের প্লেনের আওয়াজ নয়।

ব্যাপারটা কী, তা বোঝার জন্য কাছে গিয়ে দেখি, হাজার-হাজার নীল পোকা

উড়ছে একটা জায়গা ঘিরে। আমার মারা জানোয়ারের মড়ির ওপরেও অনেক সময়ে এই মাছিগুলো পড়ে, তবে মড়ি লুকিয়ে রাখি, পাতা-টাতা চাপা দিয়ে, তাই অনেক সময়েই দেখতে পায় না ওরা। জড়ামড়ি করে ওরা একই জায়গাতে উড়ছে, উঠছে; বসছে।

ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। চারদিক সাবধানে দেখে নিলাম। চারদিকের গাছের ওপরেও। না, অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেলাম না। তখন আরও একটু এগিয়ে গিয়ে মাছিগুলোর ওপরে পড়ে, থাবা দিয়ে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম। মাছিগুলো একখণ্ড নীল শব্দময় মেঘের মতো আমার মাথার ওপরে উঠে গিয়ে ওইভাবেই শব্দ করতে লাগল কিছুটা উঁচুতে।

দেখি, একটি বিরাট পুরুষ নীলগাই পড়ে আছে। ভাল করে তাকে নজর করে দেখলাম। না, কোনও বাঘ বা চিতা মারেনি তাকে। কোনও সাপেও কামড়ায়নি। কোনও মানুষের গুলি, রাইফেলের গুলি; তার পেট এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে। পাশ ফিরে শুয়ে আছে নীলগাইটা। পেটের যেদিকটা মাটিতে আছে সেইদিক দিয়েই গুলিটা ঢুকেছিল। আর যেদিক ওপরে আছে সেইদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি। পেটের মধ্যে একটা বিরাট ক্ষত। তা থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসে পাশের গাছের ডালে-ডালে আটকে আছে। কিছু নাড়িভুঁড়ি হয়তো দিনের বেলাতে শেয়ালে, হায়েনাতেও টেনে বের করে থাকতে পারে। কিন্তু তা হলে তো তারা মাংসও খেয়ে যেত!

মনে হয়, গুলিটা খেয়েছে বেচারি কাল শেষ রাতে এবং আজই ভোরের দিকে সে যন্ত্রণায় কাতরাতে-কাতরাতে মারা গেছে। ওর পড়ে থাকার জায়গাতেই রাতে জিপ থেকে গুলি করেছিল। অথবা, গুলি অন্য জায়গা থেকেও করে থাকতে পারে। গুলি খাওয়ার পর নীলগাইটা যতখানি পারে দৌড়ে এসেছে। পেট থেকে বেরিয়ে-আসা নাড়িভুঁড়ি গাছের নিচু ডালে-ডালে আটকে যাওয়াতে বোধ হয় আর যেতে না পেরে ওইখানেই পড়ে গেছে।

রাইফেলের মার এইরকমই হয়। শরীরের কোনও জায়গাতে লাগলে, তা অন্যদিক দিয়ে শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। মানুষেরা যাকে বলে 'ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল্ হয়ে বেরুনো', তাই আর কী!

আমি ভাবছিলাম, শিকার তো আমরা রোজই করি। কিন্তু এইরকম আনাড়ির মতো করি না। আমাদের হাতে যারা মরে তাদের দু'সেকেন্ড থেকে দু'মিনিটের মধ্যেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কখনও কখনও অবশ্য যেসব জানোয়ার আমাদের বেশি হয়রান করে তাদের একটু কষ্ট আর ভয় পাওয়ানোর জন্য মাটিতে পট্‌কে দেওয়ার পরেও একটু রয়েসয়ে মারি। তার ভয়-পাওয়া ছল্‌ছলে চোখ দেখে খুশি হই। এক ধরনের বীভৎস আনন্দ পাই। আনন্দ পাই, কিন্তু তা করি ইচ্ছে করেই। এই মানুষেরা রাইফেলের গুলিটা যদি ঠিকঠাক জায়গায় লাগাতে পারত,

জানোয়ারের প্রাণ নিমেষেই বেরিয়ে যেত। বড়জোর এক-দু'মিনিট দেরি হতে পারে। কিন্তু এরা আসলে শিকারি নয়। ভিতুর ডিম। জিপ থেকে আলো ফেলে জানোয়ারের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে তারপরও তাদের গুলি করার এই ছিরি! ছিঃ, ছিঃ।

বড় কষ্ট হল আমার, পুরুষ-নীলগাইটাকে দেখে।

অন্ধকার ধীরে-ধীরে পশ্চিমাকাশের সবটুকু রং শুষে নিল। নিথর হয়ে পড়ে আছে সে। অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছে। তার মৃত শরীর ছুঁয়ে-থাকা, শরীরের ওপরে ভিড়-করা; নীল মাছিগুলোও এবারে তাকে ছেড়ে সরে যাবে। ওরা অন্ধকারকে ভালবাসে না। আমি যেমন বাসি।

মৃত্যুর সঙ্গে অমিও রোজই পাঞ্জা লড়ি। প্রায় প্রতি রাতেই কোনও-না-কোনও জানোয়ারের প্রাণ নিই।আবার প্রাণ দেওয়ার জন্যও তৈরি থাকি। মৃত্যু, আমার মতো কোনও বাঘের কাছেই শোকের ঘটনা নয়। কিন্তু এই মৃত নীলগাইটি মৃতই নয় শুধু, স্বয়ং মৃত্যুর চেয়েও এ মৃততর। মৃত্যু একে পাথরের মতো নিথর করে দিয়েছে। এই গরমেও শীত উঠছে এই মৃতদেহের গা থেকে।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার পথে যাব, ঠিক সেই সময়েই নীলগাইটার পেছনের একটি মস্ত বড় কেঁদগাছের ওপর থেকে এক ঝলক তীব্র আলো এসে আমার সামনের দু'পায়ের ওপরে পড়ল। এবং দু'চোখেও। তার ব্যবহার দিয়ে মা যা শিখিয়েছিল তা মনে পড়তেই, আমি চোখ বন্ধ করে এক লাফে পেছনে সরে এলাম। কিন্তু আমিও লাফ দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই সেই গাছ থেকে একটি রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, আমার ডান পা-টাতে যেন বাজ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে আর এক লাফ মেরে আমি অন্ধকারের গভীরে চলে গেলাম। চলে গিয়ে, জমি নিয়ে, একটি কালো পাথরের আড়ালে মাটির সঙ্গে শরীর মিশিয়ে শুয়ে পড়ে দেখতে লাগলাম কী হয়! কে মারল আমাকে? এবং কেন আমি দেখতে পেলাম না তাকে?

রাইফেলের শব্দের গুম্‌গুমানি আওয়াজ পাহাড়ে-পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যাওয়ার পর পাহাড়ের শিরদাঁড়ায় অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এলো এবং রহস্য। তা ছিদ্রিত হচ্ছিল শুধু রাত-ঝিঝির ডাকে। রাইফেলের শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই টারা নদীর দিক থেকে এবং এই পাহাড়ের উপত্যকা থেকে বনে, পাহাড়ে তুমুল হইহল্লা তুলে কোট্‌রা হরিণের ব্বাক্‌-ব্বাক্‌ এবং হনুমানের দলবদ্ধ হুপ-হুপ-হুপ-হুপ আওয়াজ উঠেছিল।পাখির ডাক, হট্রিটি-হুট-হুট-হুট হট্রিটি-হুট -হট্রিটি-হুট শোনা যেতে লাগল। সেই ডাক, রাতকে নিস্তব্ধতর করল।

এতদিন প্রায়ই কথাটা মনে হয়েছে। কিন্তু আজ ডান থাবাটা চোট খাওয়ার পরই যেন পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, সেই-যে শজারুটার কাঁটাগুলো ঢুকেছিল গায়ে, পায়ে, গলায়; সেগুলো বেশ যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে। এমনিতেই ডান

পা-টা ফেলার সময় লাগত গোড়ালির কাছে। এখন থাবাতে চোট পাওয়ার পর পায়ের থাবার ওপর যাতে ভার না পড়ে বেশি, তেমন করে পা ফেলতে গোড়ালির কাছে ওই শজারুর কাঁটাটি যে বেশ অনেকখানিই গেঁথে আছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

খুবই চিন্তায় পড়লাম।

অনেকক্ষণ লাগল আমার গুহায় গিয়ে পৌঁছতে। গুহার সামনে সাদা পাথরটার চাঙড়ে বসে ভাল করে দেখলাম চোট পাওয়া জায়গাটাকে। জোর বেঁচে গেছি। প্রথমত গুলিটা লাগতে পারত বুকে বা গলায়, বা মাথায়। ডান পায়ের থাবায় লেগেছে, যদিও থাবার মধ্যিখানে লাগলে আরও বেশি বিপদ হতে পারত। কড়ে আঙুল আর তার পাশের আঙুলটা উড়ে গেছে নখসুদ্ধু। সেখানে একটি গর্ত। তবে ওপর থেকে গুলি করেছে বলে গোড়ালিটা ভাঙেনি। গোড়ালি ভেঙে গেলে কী যে হত কে জানে! এখনই কী হবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। শিকার ধরতে পারব তো?

ভীষণই যন্ত্রণা হচ্ছে। এখনও রক্ত বেরোচ্ছে। জিভ দিয়ে চেটে- চেটে রক্ত খাচ্ছি। নিজের রক্ত নিজেই। আমরা যে বাঘ। আমাদের বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই। সবাই থাকে, তবে সামান্য ক'দিনেরই জন্য। তারপরই একা। একা থাকা, একা ভাবা, একা বাঁচা, একা মরা। নিজেই নিজের আনন্দে খুশি হওয়া, নিজের দুঃখে দুঃখী, নিজের অসুখে ও দুর্ঘটনায় নিজেই একা নিজের চিকিৎসা করা। নিজেই নিজের চুল আঁচড়াই, লোম পাট করি, গায়ের পোকা তুলি। মরার সময়ে নিজেই নিজের মনোমতো জায়গা বেছে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ি, নিরিবিলি; কোনও ফুলঝরানো গাছের নীচে। কিন্তু বাঘেদের কোষ্ঠী বড় আশ্চর্যের। স্বাভাবিক মৃত্যু বা বিছানায় শুয়ে মৃত্যু খুব কম বাঘেদের জীবনেই ঘটে। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলি আমরা। আমাদের সামনের দুই থাবায় আর দাঁতে মৃত্যুর দস্তানা যেমন, তেমনই আমাদের মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়েও যমরাজ জন্মমুহূর্ত থেকে পেছন-পেছন ঘোরে। জন্মাবার পর আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ-বা তার নিজের বাবারই খাদ্য হয়। কেউ সাপের কামড়ে মারা যায়। মা দূরে থাকলে কাকেও বা মানুষে ধরে নিয়ে যায়। হায়েনা বা শেয়ালেও মওকা খোঁজে। আর বুনো কুকুরের দল এসে গেলে তো বাঁচাই মুশকিল হয়। বড় বাঘেদেরই হয়। আর বাচ্চারা তো কোন্ ছার।

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে শিকার ধরতে গিয়ে শম্বরের লাথিতে, দাঁতালো শুয়োরের ঢুঁয়ে, হাতির শুঁড়ে আর পায়ে, বাইসনের এবং বুনো মোষেদের শিঙে, অন্য বাঘ-বাঘিনীর সঙ্গে লড়াইতে, নদী পেরোতে গিয়ে কুমিরের দাঁতে আমাদের মৃত্যু, জন্মক্ষণ থেকেই আমাদের চোখে মুখ-হাঁ করে চেয়ে থাকে। প্রতিক্ষণই আমাদের পায়ের পাতার ওপরেই থাকতে হয়। সজাগ। ঘুমোবার সময়েও

আমাদের কান-চোখ সজাগ থাকে। চোখের ওপরে একটু ছায়া, দূরে একটু পাতার মচ্‌মচ্‌ শব্দ, বা কারও পায়ের চাপে কুটো ভাঙার সামান্যতম আওয়াজেই আমাদের তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠতে হয়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা শান্তি বলতে আমাদের কিছুই নেই। স্থায়ী ঠিকানা বলতেও কিছু নেই। বাবার নাম জানি না আমরা। আমাদের বিয়ে হয় না। বউ ঘর করে না আমাদের। তবে ছেলেমেয়ে হয়।

আমরা বাঘেরা, সুযোগ পেলেই আমাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও খেয়ে ফেলি। ছেলেমেয়ে হওয়ার পরই তাদের মা আর তাদের ছেড়ে পুরুষ বাঘেরা তাদের নিজের নিজের একাকী জীবনে ফিরে যায়। অনেক সময় ছেলেমেয়ে হওয়া অবধিও বাবারা অপেক্ষা করে না। তার অনেক আগেই চলে যায়।আমরা, আমাদের ছেলেমেয়েদের নাম জানি না। তাদের চিনতে পর্যন্ত পারি না। কোনওদিন আমার ছেলেকে আমি চিনব না এবং আমার ছেলেও আমাকে চিনবে না বলেই সীমানা নিয়ে ছেলের সঙ্গে আমার প্রবল যুদ্ধ হতে পারে। পারে আমার বাবার সঙ্গেও। এবং সে যুদ্ধে, যুবকের কাছে বৃদ্ধের হেরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তাই নিজের ছেলের হাতেও আমার মৃত্যুর দস্তানা।

আমাদের এই বাঘের জগতে "আমিই" শেষ কথা। "আমিই" আদি। "আমিই" অন্ত। মধ্যে, শুধু দিনের-পর-দিন, মাসের-পর-মাস, বছরের-পর-বছর একা-একা ভাবা আর শিকার করা। খাওয়া আর ঘুমুনো। আর এই সুন্দর পৃথিবীকে তার বিভিন্ন ঋতুতে নতুন-নতুন রূপে দেখা।

আমরা বাঘেরা সত্যিই মানুষদের সন্নিসিদের মতো। আমরা মৌনী। পর্বতের গুহায় অথবা গভীর অরণ্যে আমাদের বাস। আমরা কখনও ভিক্ষা করে খাই না। যা জোটে, তাই খাই। আমরা কুল্‌কলানো কথা-বলা বাচাল মানুষ্‌দের এড়িয়ে চলি। ভিড় থেকে অনেক দূরে আমাদের বাস। এই পৃথিবীতে বাঘের মতো, না বলে আমাদেরই বলি; আমাদের মতো আর কোনও জানোয়ার নেই, স্তন্যপায়ী। আমরাই আমাদের তুলনা।

খিদেও পেয়েছে, জলপিপাসাও পেয়েছে খুবই। কিন্তু নিরুপায়। এই নিয়ে তিনরাত উপবাসে আছি। হাতির বাচ্চার লোভে দু'রাত বৃথা গেল। আর আজ এই তৃতীয় রাতের প্রথমেই মরতে-মরতে বেঁচে গেলাম। থাবার ক্ষত একটু কেন, পুরোপুরি না শুকোলে তো কিছু শিকারও করতে পারব না। আজও কিছু খেতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সূর্য ওঠার আগে জল খেতেই হবে।পিপাসাতে বুক ফাটছে।

সকাল থেকেই আকাশে মেঘ-মেঘ করেছে। সেইজন্য সারাটা দিন আরও প্রচণ্ড গরম গেছে। বৃষ্টি না নামলে বড় কষ্ট সকলেরই। প্রত্যেক জানোয়ার ও প্রাণীরই জলের বাবদে বড়ই কষ্ট এই সময়ে।

হাতির দলের বৃংহণ শোনা যাচ্ছে নিচে টারা নদীর খোল থেকে। ওরা শরীর ডুবিয়ে বসে আছে জলে। একদিক দিয়ে ভাল হয়। ওরা শরীর ডোবালে জলের আয়তন বেড়ে যায়। অন্য ছোট জানোয়ারেরা অপেক্ষাকৃত দূর থেকেই জল খেতে পারে।

ভাবলাম, একটু ঘুমিয়ে নিই। ডান পা-টা নিয়ে সত্যিই বড় চিন্তাতে পড়লাম। থাবাটা চাটতে গিয়ে দেখলাম শজারুর কাঁটা যেখানে ঢুকে ভেঙে গেছে, গোড়ালির ওপরে সেখান থেকে কী যেন পুঁজের মতো বেরোচ্ছে।

সামনের থাবাতে মাথা রেখে যে ঘুমোবো তারও উপায় নেই। তাই কাত হয়েই শুলাম। ক্লান্তিতে ও যন্ত্রণায় শোওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। দুপুরের গরমের জন্য আজ একটুও ঘুমোতে পারিনি। চিন্তা করতে চাইলেও চিন্তা আমরা করতে পারিনা। মানে, মানুষেরা যাকে চিন্তা বলে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎই এক মিশ্র ফুলের গন্ধে এবং দূরাগত ঠাণ্ডা হাওয়াতে নাক ভরে গেল। উঠে বসে দেখি, পুব-আকাশে ঘন কালো মেঘ। জোরে হাওয়া দিয়েছে। সেই হাওয়ার মুখে উড়ে আসছে লক্ষ-লক্ষ ঝরা পাতা। ফুল। দগ্ধ পৃথিবীতে প্রথম বৃষ্টির গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছে সেই ফুলের গন্ধ। দারুণ মিষ্টি সেই গন্ধ। সেটা কোনও বিশেষ কিছুর গন্ধ নয়। অরণ্য-প্রকৃতি প্রখর গ্রীষ্ম-দিনের পর এবারে চান করতে যাবে। এ গন্ধ, সেই চান করতে যাওয়ার আগের মুহূর্তের গায়ের গন্ধ। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। কে জানে, কোন পাহাড়ের ঢালে বা উপত্যকায়! সেই সদ্য বর্ষণের গন্ধ বয়ে নিয়ে জোরে ছুটে আসছে হাওয়া। গাছে-গাছে ব্যাঙেরা উল্লাসে ডেকে উঠেছে। কিন্তু ঝিঁঝিঁরা থেমে গেছে। বৃষ্টি থামলে আবার শুরু করবে তাদের ঐকতান। প্রথম বর্ষাবরণের তীব্র আনন্দে বিধুর হয়ে যত চতুষ্পদ, যত পাখি, যত পোকামাকড় সবাই অর্ধস্ফুট আওয়াজ করছে। যে-অভাগা গ্রীষ্মবনের তাপের দহনের পর প্রথম-বর্ষা নামা দেখেনি অরণ্য-পর্বতে, তার জন্মই বৃথা।

এবারে জল পড়তে শুরু হল ফোঁটা-ফোঁটা। তারপর জোরে। মানুষদের রান্না করার গরম কড়াইয়ে জল ফেললে যেমন "ছ্যাৎ" আওয়াজ করে সেই জল যেমন এক ফুৎকারে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়; প্রথম বৃষ্টিও পৃথিবীর এই সুন্দর কোলে পড়ে চকিত শব্দমঞ্জরীর সঙ্গে সুগন্ধি বাষ্প হয়েই উড়ে যাচ্ছে।

তারপরই অঝোর ধারে ঝরতে লাগল বৃষ্টি। আর তার সঙ্গে দূরের দিগন্তরেখায়, যে-দিগন্ত, পাহাড়ের উঁচু-নিচু পিঠে ভাঙা-ভাঙা, যে-দিগন্তে শিমুলের পাহারা, গেণ্ডুলিদের মাথা নাড়া; সেই দিগন্তরেখায় ঘন-ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। ঘন-ঘন মানে, মুহূর্তের বিরতি দিয়ে-দিয়ে।

এখন এমনই চলবে সারারাত। মেঘের মাদল আর বাদলের মধ্যে মুহর্মুহু চোখ-ঝলসানো আলোর ঝলকানি। সারারাত। অবিরত।



বৃষ্টির মধ্যেই শুয়ে রইলাম। বৃষ্টির ফোঁটাকে চুমু খেলাম। তারপর মুখ হাঁ করে শুয়ে রইলাম বৃষ্টির দিকে চেয়ে। শরীর ভিজে গেল। যাক। নীচের নদী থেকে হাতিদের ঘন-ঘন বৃংহণের আওয়াজ ভেসে আসছিল তীব্রতার সঙ্গে। এই সিক্ত প্রকৃতি প্রত্যেকটি তুচ্ছতম শব্দকেও প্রচণ্ড বলবতী করেছে। প্রতিটি শব্দ তীব্রতর হয়ে, দ্রুততর হয়ে ছুটে যাচ্ছে দিগ্বিদিকে। হাতির বৃংহণের তো কথাই নেই। বহুক্ষণ চললো এই বর্ষণ।

সমস্ত প্রকৃতি এখন শান্ত। তৃপ্ত। প্রতিটি জীবজন্তু। পাখি। প্রজাপতি। আমার গুহার সামনেই পাথরের মধ্যে যে গর্তমতো হয়েছিল যুগযুগান্ত ধরে গুহার মাথা গড়িয়ে পাথরের ওপরে বৃষ্টির ধারা নালার মতো পড়ে-পড়ে, সেখানে জল জমে গেছে। আমার আর নদী অবধি যেতে হল না। কষ্ট করে ওইটুকু নেমে এসে তৃপ্তি করে জল খেলাম।আঃ।

আজ যদি সারারাত এমন তোড়ে বৃষ্টি হয় তবে সব নালাতে আর ঝোরাতেই জলের ধারা বইবে জোরে। কাল, টারা নদী এবং অন্য সব নদীতে বান আসবে। হয়তো আসবে শেষরাত থেকেই। নদীর দু'পাশে যেসব দহ আছে, বনের গভীরে-গভীরে যেসব দোলামতো জায়গা আছে সব জলে ভরে যাবে।তারপর রৌদ্রতাপে আবার শুকিয়ে যাবে সেসব। তখন আবার আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে হবে বৃষ্টির প্রার্থনাতে।



পরদিন ঘুম ভাঙতেই এক আশ্চর্য, সুন্দর, অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে আনন্দে, অবিশ্বাসে, হতবাক হয়ে গেলাম। কে জানে, কী করে আগে এ দৃশ্য চোখ এড়িয়ে গেল। আমার জীবনে এই তো প্রথম বর্ষা নয়!

কাল সন্ধে অবধি যে লক্ষ-লক্ষ গাছকে রুক্ষ, শুষ্ক, বিবাগী, পত্রহীন দেখেছি তাদের প্রত্যেকেরই প্রত্যেক ডালে-ডালে এই বছরের প্রথম রাতভর বৃষ্টিতে নতুন পাতা এসেছে। গুঁড়ি-গুড়ি, ছোট্ট, সুন্টুনি-মুন্টুনি কুঁকড়ে-থাকা পাতারা। সমস্ত জঙ্গল-পাহাড়ে কিশলয়ের আগমনে সেই পোড়া মাটির কালো-কালো রূপটি জাদুবলে বদলে গিয়ে সবুজের পতাকা উড়েছে দিকে দিকে। অবাক হয়ে যেতে হয় প্রকৃতির এই প্রাণের খেলা মনোযোগ দিয়ে দেখলে। বিস্ময়ে, ভাল লাগায় গা শিউরে ওঠে। কাঁচা মাংসের কারবারি আমি বাঘ। কিন্তু আমার এই আদিগন্ত রাজ্যের বনে-বনে পাহাড়ে-কন্দরে প্রকৃতির যে লীলাখেলা চলে প্রতি ঋতুতে, প্রহরে-প্রহরে তার নতুন-নতুন শাড়ি বদলানো, তা চোখে না দেখার মতো বেরসিক আমি নই। কোনও বাঘই নয়। প্রকৃতিরই পুত্র আমি। নিজের মা না-হয় ছেড়ে গেছে। কিন্তু আসল মা তো আছেই। এই মা-ই তো আসল মা। আমাদের প্রত্যেকের মা। আমার এই আসল মায়ের মতো সুন্দরী আর কোনও বাঘিনী বা মানুষী আমি দেখিনি। এই মায়ের কোলেই আমার জন্ম। যেন এই মায়ের কোলেই মরতে পারি।

জল তো খেলাম, কিন্তু একেবারেই নড়তে পারছি না। দু-দুটো নখ-মাংসসমেত, আঙুলসমেত পায়ের পাতা থেকে গুলিটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে। সোজা কথা তো নয়। গায়ে জ্বর-জ্বর লাগছে। পায়ে অসম্ভব ব্যথা। ফুলে গেছে সমস্ত ডান পা-টা। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। এখন কী করি? এই পা নিয়ে কোথাও দূরে গিয়ে শিকার ধরা অসম্ভব।

আমার গুহার কাছেই একটা মস্ত বড় কালোজামের গাছ ছিল। তার পাতা এখন ঝরে না। কখন ঝরে দেখতে হবে তা। তার ডালে-ডালে ঝাঁপাঝাঁপি করে একদল বানর কালোজাম খাচ্ছিল। কোনক্রমে গুহা ছেড়ে নেমে ডান পা-টা তুলে, বাকি তিন পায়ে কোনওক্রমে আড়ালে-আড়ালে চলে সেই গাছের তলায়

পৌঁছে হুঙ্কার ছাড়লাম একটা। দুটো ছোট বানর পড়ে গেল। দুই থাবা দিয়ে দুটোকে ধরতে গেলাম। ওমা, দেখি ডান-থাবাতে যাকে চেপে ধরেছিলাম সে রক্তাক্ত অবস্থাতেই আবার তরতরিয়ে গাছে চড়ে গেল। বাঁ-থাবা দিয়ে যেটাকে ধরেছিলাম সেটারই ঘাড় কামড়ে গাছতলাতে বসেই খেলাম। খেতেও ডান হাতের খুবই প্রয়োজন হয় আমাদের। যদিও বাঁ হাতও সমান প্রয়োজনীয়। খেয়েদেয়ে আবার তিন পায়ে গুহাতে ফিরে এসে, গুহার কাছের পাথরে জমা জল খেয়ে ঘুম লাগালাম। যন্ত্রণায় ঘুম হবে বলে মনে হল না। তবে খাওয়ার ও জল খাওয়ার পর ভাল লাগছিল খুব। কিন্তু ভাল লাগাটার মধ্যেই পায়ের চিন্তা বড় ভাবিয়ে তুলল।

পা যদিও, তবু ওটি হাতই। ডান হাত।

আজ সকালে বনে-বনে পাহাড়ে-পাহাড়ে পাখিদের মেলা বসেছে। একটানা প্রখর গ্রীষ্ম-দিনের পর বৃষ্টি হওয়াতে, প্রতি গাছে-গাছে কিশলয় আসাতে; ওদের ভারী আনন্দ। গাছে পাতা এলে, পোকা আসবে, ফুল আসবে; ফল আসবে। ওদের খাওয়ার অভাব থাকবে না। ওদের আর কতটুকু জল খেতে লাগে। ওদের খাওয়ার মতো জল এখানে-ওখানে পেয়ে যাবে। দূরে-দূরে নদীতে জল খেতে গিয়ে সাপের আর ঈগলের আর বাজের খাদ্য হতে হবে না ওদের। ময়ূর ও মোরগেরা তো বাঘ-চিতারও খাদ্য হয়।

কাল রাতে, সম্ভবত মাঝরাতে একটি তীক্ষ্ণ অলক্ষুণে তীব্র ডাকে ঘুম ভেঙে গেছিল আমার। শুধু আমারই নয়, সব জানোয়ার আর পাখিরই। হয়তো টারা বস্তির মানুষদেরও ঘুম ভেঙেছিল। বস্তির দিক থেকে একটু মৃদু শোরগোলও ভেসে এসেছিল।

এমন ভয়-পাওয়ানো পাখির ডাক আমি কোনওদিনও শুনিনি। বাঘও ভয় পায় এমন জিনিস সংসারে বেশি নেই। কিন্তু আমার সত্যিই ভয় লেগেছিল। উঠে বসে, ভাল করে নজর করে দেখি; তখনও বৃষ্টি নামেনি, কিন্তু শনশন করে হাওয়া দিতে শুরু করেছিল। কালো আকাশের পটভূমিতে, একটি পাতাঝরা বিরাট শিমুলের মগডালে বসে পাখিটা। মুখটি ওপরে আকাশের দিকে তুলে ওইরকম গায়ে-কাঁটা-দেওয়া ডাক ডাকছিল। বেশ বড় পাখি। কি পাখি?

অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে লক্ষ করার পরে দেখি একটা ঈগল। মানুষেরা এদের ডাকে,'ক্রেস্টেড হক্ ঈগল' বলে। এমন করে ডাকছিল পাখিটা, যেন কোনও মানুষ মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে। পাখিটার পেটটা সাদা, গলায় কালো-কালো লম্বা-লম্বা দাগ আর তার মাথার পেছনে কালো-কালো এলোমেলো ক'টা পালক। শন্‌শনে হাওয়াতে তারা পত্‌পত্ করে উড়ছিল। দিনেরাতে আমার চোখের দৃষ্টি সমান, তাই দেখতে অসুবিধে হয়নি।

দুঃখ রয়ে গেল এই যে মানুষদের মাচাটা, দু-দুটো মাচা আর লুকিয়ে-থাকা

মানুষদেরই দেখতে পেলাম না। আমার ডান হাতটা তারা ভেঙে দিয়ে গেল।

প্রতিহিংসার ইচ্ছে যে জাগেনি, তা নয়। তখনই ভেবেছিলাম যে, ঘাপটি মেরে পড়ে থাকি ওদের গাছের কাছে বুকে হেঁটে-হেঁটে গিয়ে। তারপর যখন গাছ থেকে নামবে তখনই দেব পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে মাথাটা পাড্হেন মাছের মতো চিবিয়ে। কিন্তু সংস্কার যে মানা করল। মা তার ব্যবহারে শিখিয়ে গেছিল যে, ওই নোংরা, ভীরু কিন্তু মহাশক্তিশালী দু'পেয়েদের থেকে যতদূরে থাকতে পারা যায় ততই মঙ্গল। ওরা নিজেরা বীর নয় বলে, বীর যারা; তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। ওরা কামিনা; ওই মানুষগুলো। নেহাত নিরুপায় না হলে, শেষ নিশ্বাসের সওয়াল না হলে ওদের ওপরে হামলা করতে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তাই নিজেকে সংযত করেছিলাম। কাল যেমন ওই অলক্ষুণে ডাক ডেকেছিল ওই ঈগল পাখিটা (আমাদের পাহাড়ে-বনে বহুরকমের ঈগল আছে), তেমনই আবার বৃষ্টির পরের শেষরাতে একটা পাখির মিষ্টি ডাকে আমার তন্দ্রা ছুটে গেছিল। অমন মিষ্টি ডাক আমি কখনও শুনিনি আগে। প্রথমে মনে হল জল চল্‌কে পড়ল। তারপর পাখিটা স্বগতোক্তির মতো ডাকল — পিটি, টুঙি, টুঙি, টুঙি, টুঙা, টুঙু, টিঙি, টিঙি, টিঙা। আরও কতরকমভাবে যে ডাকল, তার ইয়ত্তা নেই।

সব পাখির গলাতেই বিধাতা একটি বিশেষ গান দেন। বুলবুলির শিস, কোকিলের কুহু-কুহু, দাঁড়কাকের ক্বা-খা, ময়ূরের কেঁয়া-কেঁয়া, মোরগের কঁকরক্ক, ফিঙের ঢেউ-ভাঙা স্বর, কিন্তু সেই স্বর বা গানগুলির কোনও বৈচিত্র্য নেই। পাহাড়ি ময়নারা অন্য পাখির ডাক নকল করে বটে সময়ে-সময়ে, কিন্তু এই পাখিটির সর্গম-এ যে-কোনও পর্দায় যে-কোনও স্বর লাগে উলটোপালটা। উদারা, মুদারা তারাতে। অথচ তার ডাক সবসময়ই মিষ্টি। শেষরাতের বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে ওই পাখিটি যেন প্রথম বৃষ্টির সকালকে বড় সুন্দর আগমনী গান গেয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

একটু পরেই তার দোসরও সাড়া দিল নীচের উপত্যকা থেকে। তারপর সে উড়ে এল এর কাছে। খুব ভাল করে নজর করে দেখি, একী, এ যে র‍্যাকেট-টেইলড্ ড্রঙ্গো। এ পাখিকে তো দেখেছি এর আগে অনেকবারই, কিন্তু তার ডাক যে এমন তা তো জানতাম না। দেখলাম দুই দোসরে খুব ভাব।

অমনই করে ডাকতে-ডাকতে, তারা যে পাহাড়ে আমার গুলি লেগেছিল, সেই পাহাড়ের দিকেই চলে গেল। শেষরাতের অন্ধকারে তাদের মিষ্টি, অবাক করা আওয়াজ ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল।



বুঝতে পারছি, আমার জীবন, আমার জীবনযাত্রা, জীবনের মানে সবই পালটে যাবে আস্তে-আস্তে। অথচ আমার কিছুই করণীয় নেই। বাঘের মতো একজন প্রাণীর জীবনে শারীরিক সুস্থতা ছাড়া, একটি অক্ষত শরীরের কামনা ছাড়া বড় কামনা আর কিছুই নেই।

গুলি লেগেছে আজ একমাস হয়ে গেছে। বনে, পাহাড়ে, বর্ষা তার সঙ্গীত ভাণ্ডারের সমস্ত রং, সুর, আলাপ, তান, গমক, গিটকিরি, লয়কারী, তানকারী, তারানা নিয়ে এসে দারুণভাবে উপস্থিত হয়েছে। সমস্ত প্রকৃতির রূপ খুলে গেছে। বর্ষাবাহার কতরকমের যে সবুজ, কতসব প্যাস্টেল রং, চেয়ে থাকলেও চোখ ভাল হয়ে যায়, মন খুশিতে ভরে ওঠে। অনুক্ষণ যেন মানুষদের মেয়েরা কাজরী গাইছে বনে বনে বর্ষাকে বরণ করে।

আমিই হচ্ছি আদিগন্ত বন পাহাড়ের এই বিশেষ অংশের একচ্ছত্র রাজা। অথচ আজ এই বর্ষামঙ্গলের ঘনঘটায় আমারই কোনও ভূমিকা নেই। আমার বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই এখন মস্তবড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কে জানে, হয়তো কোনো রাজারই বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকেনা কোনো রাজ্যেই। রাজা নয়; প্রজারাই সব রাজ্যের প্রাণস্পন্দন। আমার গুহার সামনের গ্রানাইটের চাঙড়ের ওপরে বসে-বসে অনেকই ভাবি আমি। বাঘেরা তো সকলেই ভাবে। আমি তাদের মধ্যেও সবচেয়ে বেশি ভাবি। কী করব, কী করা উচিত, তবু ভেবে পাই না। নিজেদের ভাবনাই ভাবি। মানুষদের পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, অসূয়া, অথবা অন্য কোনো মন্দ-চিন্তার কথা আমরা জানি না পর্যন্ত।

কাল বিকেলে একজোড়া লাল পাখি এসে বসেছিল বড় শিমুলটার ডালে। সত্যিকারের বড় পাখি। অরেঞ্জ বা ক্রিমসন মিনিভেট-এর মতো ছোট পাখি নয়। টারা বস্তির মানুষেরা বলে যে, যে-বছরে এই পাখি এসে বসে এবং বাসা বেঁধে এই পাহাড়ে-জঙ্গলেই ডিম পাড়ে, সে-বছরটা বড়ই অলক্ষুণে বছর। সে-বছরে ভূমিকম্প, কী বন্যা, কী খরা, কী মানুষখেকো বাঘ কিছু-না-কিছু তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখবেই। এই বিশ্বাসের জন্যই ওই লাল পাখির জোড়া এলেই পাখিরা যে গাছে প্রথম দেখা দেয় সেই গাছের নীচে গ্রামের মানুষেরা পুজো

দেয়। ছাগল এনে, মুরগি এনে বলি দেয়। ঘড়া-ঘড়া মহুয়া পেটে ঢালে। তারপর মেয়ে-পুরুষে সারারাত মাদল আর ধমসা বাজিয়ে নাচে। ধাধাম্-ধ্রাম্-ধ্রিড়িকি-ধিনা-ধ্রাধাম-ধ্রাম।

ওরা তো ওদের সংস্কার নিয়েই থাকে। তবু এই বন-পাহাড়ের মানুষেরা অন্যদের থেকে ভালো।

কিন্তু আমি যে বাঘ! আমি আছি অগণ্য শতাব্দী ধরে এই বনে পাহাড়ে। আমি থাকব একবিংশ শতাব্দীতে। এবং সমস্ত অনাগত শতাব্দীতে। আমার মধ্যে আমার সামনের দুই থাবার মধ্যে মহাকালকে আমি থামিয়ে রেখেছি। এই থাবা দিয়ে আমি ভোরের লাল সূর্যকে দিগন্ত থেকে পাকা মাকাল ফলের মতো ছিড়ে এনে পৃথিবীতে গড়িয়ে দিই। দিনশেষে সপ্তরশ্মির চ্ছটায় বিধুর সূর্যকে এই থাবা দিয়েই চাঁটি মেরে সরিয়ে দিই দিগন্ত থেকে। উড়িয়ে দিই মহাকাশে।

কিন্তু আমি যে বাঘ, একজন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী, কম্পিউটার-বিশারদ আধুনিক মানুষের মতোই সংস্কারমুক্ত আমার মন। আমি যে বাঘ। আমি যে স্বয়ম্ভর। আমি যে একা। এবং একেশ্বর। স্বয়ম্ভূও বলতে গেলে। স্বরাট, সম্রাট আমি।

আমারও মনে কেন এই লাল পাখি দুটো ছায়া ফেলে?

ছায়া?

কিসের ছায়া? রক্তের ছায়া?

রক্তপাতের ছায়া?

হাঃ।

কাল সন্ধেবেলা এইখানে বসেই দেখতে পেলাম পাহাড়ের দক্ষিণের ঢালে যেখানে জুম চাষের জন্য বস্তির লোকেরা গরমের প্রথমে আগুন দিয়ে জঙ্গল পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেখানে কালো পোড়া কাঠ আর ছাই-হওয়া পাতা-ঘাসেদের মধ্যে-মধ্যে বর্ষার জল পেয়ে নতুন সতেজ-সবুজ ঘাস বেরিয়েছে। একদিন চাষ হত। এবং আবারও হবে।

কোন্ পাখি, কোন্ ভ্রমর ঠোঁটে আর শুঁড়ে করে কোন্ ফুল-ফুলের বীজ এনে এখানে ফেলে দিয়েছিল। সেই বীজ মাটির নীচে সুপ্ত ছিল। এখন এই জলধারার আশীর্বাদসিক্ত হয়ে তারা প্রাণের সঞ্চার করে মাটি ভেদ করে মাথা তুলেছে।

এই জঙ্গলে-পাহাড়েই জন্মাবধি বড় হয়ে ওঠাতে আমি সৃষ্টির রহস্যে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে থাকি। নব- তৃণদল মাথা তোলার চেয়েও, গাছে-গাছে নতুন কিশলয় আসার অবাক আনন্দের চেয়েও অনেক বেশি অবাক করে আমাকে এইসব অগন্য বীজের, প্রাণের, মাটির তলায়, পাহাড়ের খাঁজে গাছের ডালে সুপ্ত থাকার রহস্যটি। কোন বাঁশি শুনে, কোন হাওয়ার পরশে আর কোন বরিষণের আশীর্বাদে যে তারা হঠাৎ সুপ্তাবস্থা থেকে প্রাণে পৌঁছবে, প্রাণে-প্রাণে; নতুন

প্রাণে, তা কারও পক্ষেই জানা বোধহয় সম্ভব নয়। বিজ্ঞান-বিশ্বাসী, ঈশ্বর-অবিশ্বাসী অনেকই জেনেছে। তবু আমার মনে হয় এখনও বাকি রয়ে গেছে কিছু। বাকি থেকে যাবে, যা জানার ছিলো আর যা জানা হয়েছে; তার মধ্যে।

সেই সতেজ সবুজ ঘাসের মধ্যে একটি একলা শিঙাল শম্বর পটাপট করে ঘাস ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছিল। পোড়া-মাটিতে জল পড়ায় উদ্ভিদের প্রাণেরই মতো অনেক পোকামাকড়ের প্রাণও সঞ্চারিত হয়েছিল। যে-পোকারা মাটিতে থাকে তাদের খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছিল একদল বন মোরগ আর মুরগি, যেন পাহাড়ের ঢালে অগণ্য লাল, হলুদ আর কালো বড়-বড় ফুলই ফুটে আছে। আর যে-পোকারা উড়ে-উড়ে বেড়াচ্ছিল, নতুন গজানো, স্বচ্ছ; মানুষের সব হিসেবের চেয়েও পাতলা ফিন্‌ফিনে ডানায়, তাদের ধরে কপাকপ করে খাচ্ছিল উড়তে-উড়তে, নানারকম পোকা-ধরা পাখিরা।

আমাদের পাহাড়ে-জঙ্গলে ফ্লাই-ক্যাচার পাখি অনেকই আছে। তবে আজ সন্ধের মুখে মুখে যারা উড়ছিল তাদের মধ্যে গ্রে-হেডেড ফ্লাইক্যাচার;প্যারাডাইস ফ্ল্যাইক্যাচার, ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ ফ্লাইক্যাচারই বেশি ছিল। আর একটিমাত্র ছিল হোয়াইট-ব্রাওড ব্লু-ফ্লাইক্যাচার। আর তাদের মধ্যিখানে কেন্দ্রবিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে বিরাট শিং এবং দাড়িগোঁফ নিয়ে শিঙাল শম্বরটা ঘাস খাচ্ছিল।

শিঙালটা "একরা" — দল তাড়িত। এইসব হঠাৎ-একা হয়ে যাওয়া জানোয়ারেরা কেন যে আমার মতো একা বাঘকে দেখে শেখে না? স্বাবলম্বনের, আত্মনির্ভরতার, একা-থাকার যে শান্ত সুখ; যে মর্যাদা, তা তাদের আমরাই দান করতে পারতাম!

যাই হোক, উঠে পড়ে, অনেক ঘুরে-ঘুরে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর শম্বরটার পেছনদিকে, শম্বরটা থেকে পনেরো পা পেছনে একটি অর্জুন ঝোপের আড়ালে পৌঁছে লুকিয়ে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ।

মোরগা-মুরগিদের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। আমাকে একবার দেখতে পেলেই মুখে এমন কঁক কঁক কঁক কঁক করে তারা ডানায় ভর্‌র্‌র্‌র্ আওয়াজ করে উড়ত যে তাতে শম্বর পগার পার হয়ে যেত। বনমোরগ-মুরগিরা যখন মাটি থেকে হঠাৎ ভয় পেয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে উড়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে চায় তখনই এইরকম ভর্‌র্‌র্ আওয়াজ হয়। খুব তাড়াতাড়ি ডানা নাড়ানোতেই ওইরকম হয়। ভারী আওয়াজ!

ফ্লাইক্যাচার পাখিরা দেখতে পেলেও হল্লা ওঠাতো। তা ছাড়া জঙ্গলের গাছে হনুমানও কম ছিল না। কোট্‌রা হরিণের তীক্ষ্ণ চোখেও কিছু অদেখা থাকে না। আর আমি গোপনীয়তা চাই বলেই এদের প্রত্যেককেই আমার ভয়।

ঠিক করলাম, অন্ধকার গভীর না হলে, জায়গা থেকে নড়বই না। শম্বরটা তখনও থাকবে ওখানে। ঘুরে-ঘুরে পটর্-পটর্ করে ঘাস ছিড়ে খাচ্ছিল ও।

যখন বুঝলাম, মোক্ষম সুযোগ উপস্থিত; ঠিক তখনই লাফ দিলাম বাঁ দিক থেকে কোনাকুনি। ঠিক ঘাড়ের ওপর পড়লাম এসে। ঘাড় কামড়ে ধরলাম। কিন্তু শম্বরটা পেছনের পা দুটো পেছনে ঠেলে দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার সামনের ডান থাবাটা প্রায় অকেজো হয়ে যাওয়াতে আমি তাকে ফেলতে পারলাম না নিচে। যদিও তার কাঁধ কামড়ে ধরেছিলাম দাঁতে। কিন্তু হলে কী হয়! তাকে কাঁধের ওপর ধরাটা জবরদস্ত না হওয়াতে, সে এক ঝট্কায় ছাড়িয়ে নিতে গেল আমার দু' হাতের বাঁধন। কিন্তু ছাড়াতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। আমার পাকড়টাও খুলে গেল। খুলে যেতেই, সে সেই রক্তাপ্লুত অবস্থাতেই তার পেছনের ডান পায়ে একটা লাথি ছুঁড়ল এত জোরে যে, তা আমার পেটে লাগতেই মনে হল লিভার পিলে সব বুঝি ফেটেই গেল। আমি আঘাতে এক মুহূর্ত অবশ হয়ে পড়তেই সে ধড়ফড় করে উঠে পড়েই শিংটা আমার দিকে করে রুখে দাঁড়াল।

তার ঘাড়ের গর্ত দিয়ে, কাঁধ দিয়ে, দরদর করে রক্ত গড়িয়ে পড়ে তার খয়েরিরঙা বড়-বড় চুলগুলোকে ভিজিয়ে আঠা-আঠা করে দিচ্ছিল। কিন্তু শম্বরও ছাড়বার পাত্র নয়। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় জাতের হরিণ সে। সেও কিছু কম শক্তি ধরে না।

শুয়ে-শুয়েই দাঁতমুখ বিকৃত করে নিজেকে যতখানি বীভৎস করে দেখানো যায় তেমন করে তার দিকে চেয়ে প্রচণ্ড গর্জন করলাম। ভাবটা, আর এক পা এগোলেই আমি চিরদিনের মতো দফা রফা করে দেব।

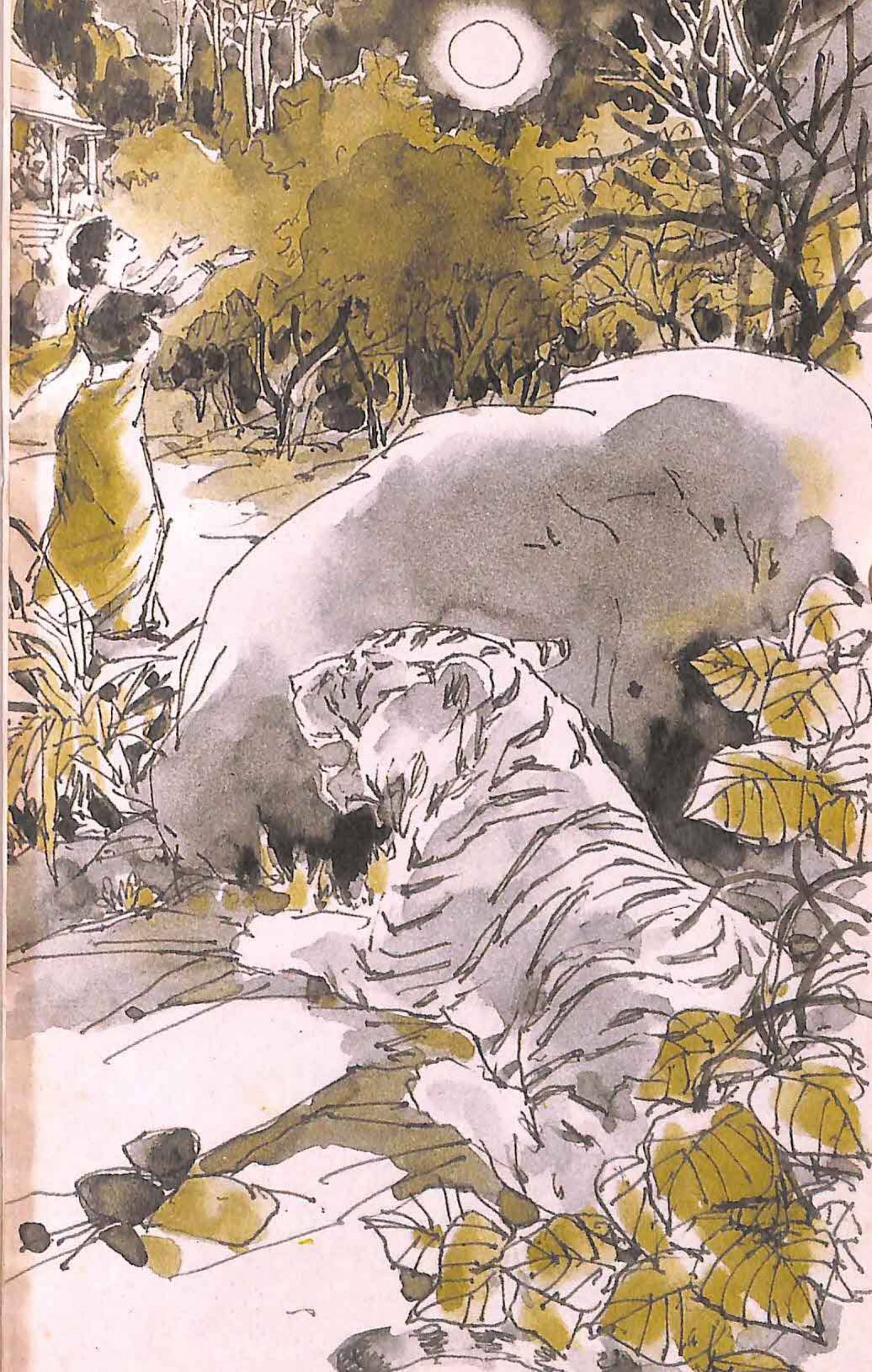
শম্বরটা মাথাটা নিচু করে শিংটা দিয়ে আমাকে গেঁথে ফেলার মতলবে দু' পা এগিয়ে এল। আমার তখনও নড়াচড়ার শক্তি নেই। কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে, টালমাটাল পায়ে সে দৌড়তে-দৌড়তে ফাঁকা মাঠটি পেরিয়ে উপত্যকার গভীর জঙ্গলের দিকে নেমে গেল। নেমে যেতে-যেতে দু'বার ডাকল, ঢাংক ঢাংক করে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুব তীব্র ডাক। সমস্ত জঙ্গলের প্রাণী জেনে গেল যে, সাবধান। বাঘ!

শিকার ধরা আমার হল না। হয়তো এরাতে হবেই না আর।

আমার দুঃখের দিন-রাত শুরু হলো।

শম্বরের লাথিজনিত পেটের ব্যথা যখন কমল তখন পায়ের ব্যথা সামলে কোনওক্রমে নদী অবধি গিয়ে জল খেয়ে ফেরার সময় পথের পাশের নিচু ডালে বসে-থাকা একটা ময়ূরকে পেছন থেকে চুপিচুপি গিয়ে ধরে ওখানেই তার পালক ছাড়িয়ে তাকে খেয়ে তারপর গুহাতে ফিরলাম।

এত পাখির মাংস খেয়েছি, জানোয়ারেরও; কিন্তু ময়ূরের মতো স্বাদু মাংস আর খাইনি। মানুষেরা বলে, 'বেস্ট হোয়াইট মিট ইন দ্য ওয়ার্লড।" মিথ্যে বলে না।



গুহাতে ফিরে আমার চিন্তা হল এইরকমই যদি চলতে থাকে তবে, তো না খেয়েই মরব। শুধু ময়ূর আর বানর খেয়ে তো একটি বড় বাঘ বাঁচতে পারে না চিরদিন! এই ক'দিনে রোগাও হয়ে গেছি বেশ। মহা চিন্তাতেই পড়লাম। বেঁচে থাকার চিন্তা। পায়ের দুটি নখই যে উড়ে গেছে শুধু তাই নয়, শজারুর কাঁটাগুলো গোড়ালির কাছে, গলার কাছে, এবং অন্যান্য জায়গাতেও, শরীরের ভেতরে বেশ পচন শুরু করে দিয়েছে। যন্ত্রণা তো আছেই! ভেতর থেকে পুঁজের মতো কী বেরোয়।দুর্গন্ধ। শরীরে সবসময় জ্বর-জ্বর ভাব লাগে।

আমাদের যেমন মা-বাবা-ভাই-বোন-বউ নেই, তেমনই ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স, হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, নার্সিং-হোম কিছুই নেই। আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রও নেই। কেওড়াতলা; নিমতলাও নেই। এই বন আর পাহাড়েই আমাদের জন্ম। এখানেই আমাদের কে জি স্কুল। তারপরে স্কুল-ফাইনাল। এখানেই খেলার মাঠ। এখানেই আমাদের মন্দির মসজিদ, চার্চ; এখানেই ধর্মশালা। আমার চিকিৎসা করার তো কেউ নেই। শুশ্রূষা করারও কেউ নেই।

বাঘেদের এই একাকিত্ব বড় মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কিন্তু যতই অসুবিধে হোক, বাঘেরা কখনও কাঁদতে বসে না বা অন্য বাঘের কাছে কোনও ব্যাপারেই সাহায্য চায় না।

আর মানুষের কাছে?

ছিঃ ছিঃ, ওই নীচ, নোংরা, বাচাল, ধূর্ত, কপট, ভীরু। ঈর্ষা জরজর দু'পেয়েগুলোর কাছে কোনও বাঘেরই কোনওদিনও কিছুমাত্রই চাইবার ছিল না।

কিছু-কিছু বাঘকে ধরে মানুষ চিড়িয়াখানোতে রেখে তাদের খুব কাছ থেকে দেখে বাঘেদের সম্বন্ধে সব জেনে নিতে চায়। চিড়িয়াখানার বাঘ, নকলি বাঘ। বুনো বাঘের সঙ্গে তাদের স্বভাব-চরিত্রের কোনও মিলই থাকে না। মানুষের দেওয়া দয়ার খাবার খেয়ে যারা মানুষ, তাদের বাঘত্বই মাটি হয়ে যায়। আজকাল আবার হয়েছে বাঘ-প্রকল্প। যেখানে বাঘেদের দুধে-ভাতে আদরে গোবরে রাখা হয় তাদের বংশবৃদ্ধির জন্য। সেই সব জঙ্গলে অঢেল শিকার। আর শিকার না থাকলে মানুষেরা মোষ খাওয়ায় তাদের। গাড়িতে বা বাসে করে বা হাতির পিঠে চড়ে বাঘ দেখতে যায় সেখানে মানুষ।

ওগুলো বাঘ নয় বেড়াল। যে-বাঘ প্রতিক্ষণের প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বেঁচে না থাকে, যার পরমূহূর্তের অস্তিত্বটুকুও অনিশ্চিত নয়; সেই বাঘ প্রকৃত বাঘই নয়। চিড়িয়াখানাতে বা বাঘ-প্রকল্পে আমাদের জাতের যারা থাকে, তারা এই জাতের কুলাঙ্গার।

দোষটা অবশ্য আমাদেরই!

আমাদেরই উচিত ছিল আফ্রিকার হাতিদের মতো হওয়া। তারা জীবনে পোষই মানে না। সত্যিই। জীবন থাকতে নয়! কেউ যদি ধরে নিয়ে গিয়ে অঢেল

খাবার দিয়ে পোষ মানাতে চায়, সে বড় হাতিকেই হোক, কী বাচ্চাকে; তারা উপোস করে দাঁতে দাঁত দিয়ে পড়ে থাকে। বন্দিদশায় না খেয়ে মরে যায়, কিন্তু কখনওই ওই দু'পেয়েগুলোর মর্জি পালন করার জন্য পোষ মানে না। তার চেয়ে মৃত্যুও ওদের কাছে ভাল।

শাবাশ!



বর্ষা শেষ হয়ে হেমন্ত এল। হেমন্ত শেষ হয়ে শীত।

শুনেছি, মানুষের অনেক শিশু ও কিশোরেরা বড় হওয়ার জন্য ছটফট করে। কেউবা দাড়ি না উঠতেই দাড়ি কামায়। গোঁফ-দাড়ি যাতে তাড়াতাড়ি গজায়, সেইজন্য।

অথচ আমার বড় হতে ভাল লাগে না। কী করে যে দিনগুলো কেটে গেল আর আমি পূর্ণ যুবক হয়ে উঠলাম, জানি না।

মাথার উপরে ঘন নীল উজ্জ্বল আকাশ। ঘন লতায়, পাতায়, চকচকে চন্দ্রাতপে বনানী গাঢ় সবুজ। তার ওপরে-ওপরে শীতের বন-বীথির লাল ধুলোর আস্তরণ পড়েছে নরম আলপনার মতো।

দীর্ঘ রাত। প্রচণ্ড শীত। ছোট্ট; উষ্ণ দিন। রোদে গরম-হওয়া পাথরের ওপরে চিত হয়ে চার-ঠ্যাং ওপরে তুলে আরামে ঘুমোই সারা দুপুর। ছোট চিতল, বার্কিং-ডিয়ার, ছোট হরিণ, খরগোশ, ময়ূর, বানর এই সবই ধরে কোনওক্রমে বেঁচে আছি। ভীষণই রোগা হয়ে গেছি আমি। গায়ে জ্বরও থাকে সবসময়। এই ক'মাসে আমার শরীরে, জীবনে অনেকেই পরিবর্তন হয়ে গেছে। একা চিরদিনই ছিলাম। কিন্তু এত একা কোনওদিন বোধ করিনি। এই একাকিত্ব সামান্য ক'দিনের জন্য ঘুচলেও বেশ হত মনে হয়।

আমার ডান থাবাটা অক্ষত থাকলে শজারুর কাঁটার ক্ষতগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু...

অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে ছিল যে, যেখানে মানুষটা আমার পায়ের পাতায় গুলি করেছিল সেই জায়গাটায় একবার যাই। চালাক আমি, কীকরে যে তখন অমন বোকা বনলাম তা জানতে ভারী ইচ্ছে করতো আমার। এই দীর্ঘ কয়েক মাসই। কিন্তু সংস্কারের বশে যেতে পারিনি। মায়ের মানা। চলে-যাওয়া ছোটর মানা।

আজ সূর্য ডোববার সঙ্গে-সঙ্গেই কী এক অজানা টানে আমি বেরিয়ে পড়লাম সেদিকপানে। ঘন্টাখানেক চলে সেই পথটার কাছে এলাম। তাড়াতাড়ি তো চলতেও পারি না আজকাল!

লাল মাটির পথ। শীতের লাল মিহি ধুলো। পাউডারের মতো।পুরু হয়ে বিছোনো আছে পথে। দেখলাম, অনেকগুলো জিপের টায়ারের যাওয়া-আসার দাগ। সবই বাংলোটির দিকেই গেছে এবং সেদিক থেকেই এসেছে।

জ্বরে আমার বেহুঁশ লাগে আজকাল। সবসময়ই যেন এক ঘোরের মধ্যেই থাকি। পায়ের চোটের ঘাটা এখন বীভৎস হয়ে উঠেছে। ছ' মাস বুঝতে পারিনি। এখন বুঝি যে, সেইজন্যই সবসময়ে জ্বর থাকে। শজারুর কাঁটার জন্য নয়।

বাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একটি না-নউরিয়া ঝোপের মধ্যে আড়াল নিয়ে বসলাম ওদিকে চেয়ে। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। শীতের শিশির ভেজা চাঁদ উঠেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে একটানা। বারান্দাতে পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বলছে। চার-পাঁচজন পুরুষ ও মেয়ে চেয়ারে বসে খুব হাসছে। গেলাসে করে কী যেন খাচ্ছে ওরা। খুব খুশি-খুশি ভাব।

একটি মেয়ে বলল, "কী সুন্দর চাঁদ আজকে ! আর তোমরা বারান্দাতেই বসে রইলে? আমি বাবা একটু হেঁটে আসতে যাচ্ছি। তোমরা কেউ যাবে?"

একজন পুরুষ বলল, "এই জঙ্গলেই সুনীলমাধব একটি বাঘের গায়ে গুলি করেছিল। আমাকে সাক্ষী রেখে। বলেছিল, বুকে গুলি লেগেছে। কিন্তু বাঘটা হাপিস্ হয়ে গেছিল। সে যদি উণ্ডেড হয়ে এ-জঙ্গলে থাকে তবে কিন্তু এতোদিনে "ম্যানইটার" হয়ে যেতে পারে।

"কী যে বলো না কমল! যে-কোনও বাঘেরই আত্মসম্মান আছে। আমার স্বামীর গুলিতে মরে তারা নরকবাসী কখনওই হবে না। গুলি লাগেইনি। তাই বাঘেরও মানুষখেকো হওয়ার কোনওই সম্ভাবনা নেই। আমি যাচ্ছি। আহা! "এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো।"

আমার কান দুটো সোজা হয়ে গেল। এই মেয়েটাই তা হলে আমাকে যে গুলি করেছিল তার বউ? সে যদি সত্যিই হেঁটে বেরোয় তবে সে যাবে আমি যেখানে বসে আছি তার পাঁচ পায়ের মধ্য দিয়ে। পথটা এখানে একটা বাঁক নিয়েছে। বারান্দার পেট্রোম্যাক্সের আলোও পৌঁছবে না এখান পর্যন্ত।

অপমানে, প্রতিহিংসায় আমার জ্বরাক্রান্ত শরীর আরও জ্বরাক্রান্ত হয়ে গেল।

আমি অসুস্থ। আমি বুঝলাম, সুস্থ অবস্থাতে যা না করা যায়;তা হয়তো সহজেই করা যায় অসুস্থ অবস্থাতে।

পা-পা করে আমি পথের আরও কাছে এগিয়ে গেলাম।

মেয়েটি গান গাইতে-গাইতে আসছে।

"এল যে শীতের বেলা, বরষ পরে, এল যে শীতের বেলা...।"

রিনরিন করে চুড়ির শব্দ উঠছে। শাড়ির খসস খসস শব্দ। সে কী যেন মেখেছে গায়ে। সুন্দর গন্ধ। যদিও গন্ধ আমি তেমন পাই না। পাইই না বলতে গেলে।

মেয়েটি যেই মোড়টাতে এসেছে, আমি এফ লাফে তার ঘাড়ে পড়লাম বাঁ দিক থেকে। তার ঘাড় আর গলা কামড়ে ধরে তাকে আমার সামনের দু'পায়ের মধ্যে ঝুলিয়ে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত আমার পাহাড়ের দিকে চললাম।দ্রুত মানে, এই শারীরিক অবস্থাতে এবং ভার বয়ে যতটুকু দ্রুত যাওয়া সম্ভব। এতটুকু শব্দ না করে তার চটিজোড়া পড়ে রইল পথে।

যতটা তাড়াতাড়ি পারি, তাই যাচ্ছিলাম। আজকাল আমি তো আর আগের আমি নেই।

কিছুটা নিয়ে গিয়ে তাকে পথে নামালাম। একটি শালগাছতলাতে। মেয়েটি খুবই সুন্দরী। দুটি উজ্জ্বল চোখে সে আমার দিকে তাকাল। তখনও সে বেঁচে ছিল। কী একটা শব্দ উচ্চারণ করল, অস্ফুটে।

মানুষের গুলি-খেয়ে মরা আমার ভাইটি; সেই ছোটর চোখ দুটিও এমনই সুন্দর ছিল।

আমি এক কামড়ে ওর মাথাটাকে কই মাছের মাথার মতো চিবিয়ে তছনছ করে দিলাম। একটা চোখ গলে গেল। অন্য চোখটা নিথর হয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে।

যেন পাথরের চোখ।

জীবিতকে মৃত করাই আমার খেলা। এর মধ্যে কোনো নৃশংসতা বা অপরাধ-বোধ নেই।অন্যের মৃত্যুই আমার জীবন!

কাপড়-জামা পরা অবস্থায় দূরে নেওয়া যায় না মানুষকে। মেয়েটা আবার কী এক জিনিসের শাড়ি পরেছে কে জানে। খসস খসস করছে। তাড়াতাড়ি করে নখ আর দাঁত দিয়ে তার জামাটামা ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার কোমরের কাছে তাকে শক্ত করে কামড়ে ধরে গুহাতে নিয়ে যাব বলে এগোলাম।

ঠিক অমনই সময়ে বাংলোর দিক থেকে বন্দুক-রাইফেলের শব্দ আর জোর চিৎকার শুনলাম মেয়ে-মরদের গলার।

"শুভ্রাকে বাঘে নিয়ে গেছে। বাঘে নিয়ে গেছে।"

আমি হাসলাম, অনেকদিন পর।

আমার ভাইটিকে, ছোটকেও মানুষে নিয়ে গেছিল। শুধু তার চামড়ার জন্য। তাদের গর্বের জন্য। আমি অভুক্ত। বেঁচে থাকার জন্যই আমার মাংসের দরকার রোজ। নিতান্ত প্রয়োজনেই তোদের বউকে নিয়ে যাচ্ছি আমি। বাঘমাত্রই গর্বিত। আর বাঘের গর্বের কথা সব মানুষেই জানে। মানুষ মেরে, তার চামড়া গুহার গায়ে ঝুলিয়ে রেখে আমরা মানুষদের চেয়ে যে উৎকৃষ্ট তা জানাবার প্রয়োজন হয় না আমাদের। একটি কচি চিতলের মাংসের সঙ্গে এই বউয়ের মাংসের কোনও তুলনাই হয় না। মানুষের; স্বার্থপর, কৃতঘ্ন, অসৎ, কপট, দু'পেয়ে জানোয়ারের মাংস কখনওই চারপেয়েদের মতো স্বাদু হয়?

বড় খিদে পেয়েছিল। তাই আমার থাবা ওরাই ভেঙে দিয়েছিলো। তাই।

গুহার ভেতরেই নিয়ে গেলাম। মানুষের মেয়েটাকে কার যেন বউ? নীলমাধব না নীলযাদব কী যেন বলল? হাঃ।হাঃ।ফিকে চাঁদের আলোয় দেখতে ভালই লাগছিল তবে খেতে তেমন ভাল নয়। একটু নুন-নুন আছে। নতুনত্ব!

যা বোঝা গেল তা এই যে, মানুষ মারা, ময়ূর মারার চেয়েও সোজা। দৌড়য় না। আঁচড়ায় না। কামড়ায় না। ঢুঁসোয় না। কোনওরকম প্রতিরোধ করারই ক্ষমতা নেই।

ভালই হল। এবার থেকে মানুষ মেরেই খাব। যে ডান হাতের থাবা তোরা অকেজো করেছিস, তোদের মারতে সেই অকেজো থাবাই যথেষ্ট।

আজ থেকে আমি মানুষের যম হব।

মানুষের মেয়েটার মাথাটা আর মাথার চুলটা আর দাঁতগুলো বাদ দিয়ে শেষটুকুরো অবধি খেলাম। অনেকদিন পর মোটামুটি পেটটা ভরল। এইবার একটু বেরোতে হবে জল খাওয়ার জন্য। তারপরেই দীর্ঘ শীতের রাত।

ফিস্‌ফিস্ করে শিশির পড়বে সারারাত। পাশ ফিরে লম্বা হয়ে ঘুমোব যতক্ষণ না সকালের পাখিদের ডাকে ঘুম ভাঙে। রাত তো মানুষদেরই ঘুমোবার সময়, আমাদের তো নয়। আমরা যে নিশাচর। কিন্তু আজ রাতে ঘুমোব।

টারা নদী অবধি আর রোজ জল খাওয়ার জন্য নামতে পারি না আজকাল। এখন শীতকালে কোনও কষ্টও নেই জলের। আমার গুহা থেকে পঞ্চাশ পা পাহাড়ের পিঠে চড়ে গেলেই একটা ঝরনা আছে। যদিও ছোট ঝরনা। চার-পাঁচ হাত ওপর থেকে ঝিরঝির করে জল পড়ে। নীচে কিছুটা জল জমে থাকে। তার চারধারে মেইডেনহেয়ার ফার্ন। বেবিজ-টিয়ারস ফার্ন। নানারকম অর্কিড। প্লানটস্। ব্রমেলিয়াডস্। দারুণ সুন্দর দেখায়।

ওইখানে আমি জল খাই আর জল খায় একজোড়া বড় ভালুক। কে জানে। যাদের ডেরায় আমি থাকি, তারাই কিনা। একদিন বাগে পেলে পুরনো অপমানের শোধ তুলতে হামলে না পড়ে! তবে জঙ্গলের জীবনে কেউই পুরনো হারের কথা মনে রাখে না।কখনও হার কখনও জিত, এই নিয়েই আমাদের জীবন। যেন-তেন-প্রকারেণ চিরদিন যে জিততেই হবে তেমন নিয়ম জঙ্গলে গ্রাহ্য তো নয়ই; ঘৃণ্যও বটে। মানুষদের পণ্ডিত জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির দর্শনে আমরা বিশ্বাসী। আমাদের "গুরু" নেই।"মা" নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের গুরু। আমাদের কোনও দেব-দেবী নেই। আমরা নিজেরাই নিজেদের পুজো করি। মানুষদের অনেকে আমাদের পুজো করে। আমরা মুহূর্ত থেকে মুহূর্তে বাঁচি। বাঘেদের জীবনে কোনও পাস্ট-টেন্স বা ফিউচারটেন্স নেই। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সও নেই। আমাদের শুধুমাত্র প্রেজেন্ট টেন্স। যা হয়ে যায়, তা হয়ে যায়। তা নিয়ে স্মৃতিমন্থন বা ভবিষ্যৎ কল্পনা করার শিক্ষা আমাদের নেই।

জল খেয়ে গুহায় ফিরলাম। একটু ভুল হয়ে গেল, নীলমাধবের না নীলযাদবের সুন্দরী বউকে নিয়ে জলটার কাছে গিয়ে খেলেই হত। ওজনে এতই হালকা ছিল শিকার। তা ছাড়া, নখ ছিল না। দাঁত ছিল না। শিং ছিল না। বইতে কোনও অসুবিধেই ছিল না। তাই অন্যমনস্ক হয়ে গুহাতে নিয়ে এসেছিলাম।

শোবার ঘরে আমরা সাধারণত খাই না। আমাদের খাবার ঘর সারা বন-জঙ্গল। মেয়েটার হাড়গুলো গুহায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে!

এতদিন খিদে নিয়ে কাতর ছিলাম। খিদে মিটতেই পায়ের ব্যথাটা আবার প্রবল হল। ব্যথাকে মনে করলেই ব্যথা বাড়ে। পা-টা ফুলে গেছে। তার ওপর গতকাল একটু অত্যাচারও গেছে পায়ের ওপর। অত ওপর-নীচ বহুদিন করিনি। ডান হাত দিয়ে খাইওনি বহুদিন।

হাড়গুলো পরদিন সকালেই নীচে ফেলে দিলাম। পরদিনের সারাটা বেলাই শুয়ে কাটালাম। সন্ধের পরে খেয়েছিলাম চারটে বড়-বড় পাহাড়ী গিরগিটি বাঁ পায়ের চার থাপ্পড়ে মেরে। খিদে বেশি ছিল না। তারপর ওই ঝোরাটায় গিয়ে জল খেয়ে এসে সারাটা রাতই শুয়ে থাকলাম। হাতটা অথবা পা-টা বড়ই যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আমার মন বলছে, এই হাতটা আমাকে আমার নিয়তির দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। গেলে, যাক।

আমরা নিয়তিকে মানি না। নিয়ত নিয়তি সৃষ্টি করাই আমাদের কাজ।

কিন্তু না মানলেও, নিয়তি নিজেই আমাদের টানে।

সেই লাল পাখি দুটো আজ সকালে আবারও এসেছিল। অদ্ভুত কর্কশ স্বরে ডাকে পাখিগুলো। পাহাড়ি গ্রামের মানুষেরা তাদের বলে 'পিড়িকাঁই'। পাথুরে-পায়রার প্রায় দু' গুণ পাখিগুলো দেখতে। তারা বাসা বানাচ্ছে। ডিম পাড়বে।

কিছুই করার নেই। মানুষদেরও নয়, আমারও নয়। তাদের তীর দিয়ে মারতে পারত মানুষেরা সহজেই। কিন্তু ওদের ভীষণই ভয়। মারে না। ওরা মরতে বড় ভয় পায় তাই ভয়কে মারতে পারেনা। পাখিগুলো যে মাটিতে মোটে নামেই না। নামলে, দিতাম শেষ করে।

পরদিন নীলগাই-এর পাহাড়ের দিকে এগোলাম। ওই পাহাড়ের খাঁজে একটা বস্তি আছে। তার নাম সারগুল। সাধারণত বস্তিটাকে এড়িয়েই চলাফেরা করেছি এতদিন। আজ বস্তির দিকেই চললাম।

আমরা হচ্ছি, বড় ও গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। মানুষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেইই বলতে গেলে। চিতাদের মধ্যে কেউ-কেউ চিরদিনই মানুষের গোরুটা, ছাগলটা, মুরগিটা, হাঁসটা ধরে খায় বলে মানুষদের গতিবিধির খবর ওরা অনেকইভাল জানে। ওরা ছিচ্‌কে চোর। আর আমরা পুরোনো দিনের

ডাকাত। আগে জমিদারের খবর পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়ে তারপর ডাকাতি করি।

তখনও বেলা ছিল। হাট বসেছে একটা জায়গায়।পাহাড়ের গা থেকেই দেখতে পেলাম। নানা রঙের সমারোহ। বয়েল গাড়ি। দিশি ঘোড়া। ছাগল-পাঁঠা। মুরগি। বগেরি-পাখি টাটকা ভেজে দিচ্ছে খদ্দেরকে। বাজে তেলের গন্ধ ছেড়েছে বিটকেল।

ভাবলাম, ভালই হল।

হাটের পথে ও যে-বাঁকটাতে বড়-বড় পাথর আছে আর টিলাটা; যেখান দিয়ে মানুষের জীপ-ট্রাকের ভয়ে যে-পথটা রোজ পার হতাম আমি, সেইখানেই কষ্ট করে উঠে এমনভাবে শুয়ে থাকবো যে, পথের লোক আমাকে দেখতে পাবে না অথচ আমি পাব। যারা টারার দিকে যাবে তাদের আমি দেখতে পাব না। কারণ পাকদণ্ডী পথ আছে পেছন দিয়ে। যারা এ পাহাড়ের গ্রাম 'কাগুডু'র দিকে যাবে, তাদের প্রত্যেককেই দেখতে পাব। এই পথ দিয়েই তারা মাইলখানেক গিয়ে বাঁ দিকের পাকদণ্ডীতে নেমে যাবে।

বেলা পড়ে আসছিল। ওখানে পৌঁছে কষ্ট করে টিলাটাতে উঠে যাবার পর বেশিক্ষণ বসে থাকতে হল না আমার।

একটু পরেই শিশু আর নারীর গলা কানে এলো। নিজেদের ভাষায় নীচুস্বরে কথা বলতে-বলতে আসছে ওরা। ছাগলটাও তার নিজের ভাষায় কী সব প্রতিবাদের ধ্বনি তুলতে তুলতে আসছে। এও কি মানুষদের কোনো রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিলো ? নইলে গলার এমন মার-প্যাঁচ কোথায় শিখলো কে জানে।

শীতের সন্ধের ঠিক আগে আমাদের বন-পাহাড়ে বড় এক বিষণ্ণতা নেমে আসে। বন থেকে এই সময় এক মিশ্র গন্ধ ওঠে। তীব্র-কটু গন্ধ। ল্যান্টানা, না-নউরিয়া, গিলিরি, মুতুরি, শিয়ারি, অর্জুন, করৌঞ্জ, কেলাউন্দা, সব কিছুর ঝাড়েরাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। তখন মৃত্যুর মতো নিথর নিস্তব্ধতা নেমে আসে। শুধু ঝিঝিরা, রাতকে আবাহনের গান করে। গাছগাছালির ফাঁক-ফোকর দিয়ে শেষ সূর্যের ম্লান আলো যেন অঞ্জলিভরে আলোর ফুলের নৈবেদ্য দিয়ে রাতকে স্বাগত জানায়।

ঠিক অমনই এক ম্লান, বিধুর, লাল আলোর অঞ্জলির মধ্যে পাথরটার সামনের পথের ফালিটুকুতে এসে পৌঁছল কুচকুচে-কালো শিশুর হাত-ধরা, ধবধবে-সাদা শাড়ি-পরা এক কুচকুচে-কালো নারী। আর কালো শিশুর হাতের দড়িতে-বাঁধা একটি ধবধবে সাদা ছাগল।

কাব্যি; বাঘেদের রোগ নয়।

আমি এক লাফে নারীর ঘাড়ে পড়লাম।

তার কোলে-কাঁধে অনেকই জিনিস ছিল। কেরোসিনের তেল। সর্ষের তেল। নুন। আনাজ। চাল। একজোড়া মুরগির ডিম। সবই ছত্রখান হয়ে পথে পড়ে



ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। শিশু। মানুষ এবং ধাড়ি-ছাগলের ভয়ার্ত বিচ্ছিরি চিৎকারে সন্ধেবেলার অপার্থিব সুন্দর শান্তি ছারখার হয়ে গেল।

পেছন থেকে কারা বলে উঠল, বাঘটা। বাঘটা। মানুষখেকো বাঘটা।

আমি ততক্ষণে আমার অরণ্যে পৌঁছে গেছি। অন্ধকারও নেমে এসেছে। সন্ধ্যাতারা ফুটেছে পশ্চিমাকাশে; নীল—সবুজ ফুলের মতো। চাঁদও উঠেছে।

আমার আর ভয় নেই।

এই মেয়েটা বেশ ভারী। লম্বা-চওড়া। এর গায়ে একেবারে অন্যরকম গন্ধ। সুনীলমাধবের না, নীলযাদবের বউ শুভ্রা কুভ্রা ছিল চাঁদের আলোর মতো, এ যেন অমাবস্যার রাত। শুভ্রার গায়ে ভিন্‌দেশের গন্ধ ছিলো। তারও শরীর! এরও শরীর! হাঃ।

কামড়ে ধরে সোজা নিয়ে এলাম সেই ফার্ন আর অর্কিডে ঢাকা ঝরনার কাছে। তারপর বেশ কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম জল খেয়ে। পায়ের ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠেছে। শজারুর কাঁটাগুলোর ক্ষতও। অথচ ভেবেছিলাম যে মিলিয়ে গেছিলো।এমনই হয়েছে আজকাল যে, শব্দ না-করে চলতে পর্যন্ত পারি না। হাঁটতে গেলেই গোঙানির মত শব্দ হয় একটা। আর তা শুনে, জানোয়ার, পাখি, বানর সকলেই পালিয়ে যায়।

আমার স্বাভাবিক শিকার, বনের পশু — পাখি ধরা আমার আর বোধহয় হবে না। মানুষ মেরেই খেতে হবে।

এই মেয়েটার মাংসটা অত নরম নয়,। তবে মাংস অনেক বেশি। তৃপ্তি করেই খেলাম। তারপর জল খেয়ে, গুহায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কাল না খেলেও চলবে। যদি খিদে পায়ও, তবে এখনও যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেই চলবে একটি পা; ডান পা-টা। সেটাকে, পাতাটাতা দিয়ে ভাল করে লুকিয়ে রাখলাম একটা ল্যানটানা ঝোপের মধ্যে। যাতে ওপর থেকে শকুন এবং নীচ থেকে শেয়াল-হায়েনা না দেখতে পায়।

খুব আরামে ঘুমিয়েছিলাম রাতে। অনেকদিন পরে। সকাল হলে গুহার বাইরে উঠে গিয়ে বাইরের পাথড়ের চাঙরের ওপরের রোদের মধ্যে আরও আরামে ঘুমোলাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ঠিক জানি না। সূর্য এখন কি মাথার ওপরে?

হঠাৎ কী একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ভেঙে গেল।

আওয়াজটা আসছে টারা নদীর দিক থেকেই। এরকম আওয়াজ আগে শুনিনি। গুহার ওপরের পাথরটার ওপরে উঠে নীচে তাকিয়ে দেখি, একসঙ্গে অসংখ্য লোক সারি বেঁধে পাহাড়ে উঠে আসছে, অর্ধ-চন্দ্রাকারে। তাদের কারও হাতে ক্যানেস্তারা, কারও হাতে বল্লম; কারও হাতে গাদা-বন্দুক। কারও হাতে আবার লোহার নাল-লাগানো লাঠি। সকলেই প্রচণ্ড চিৎকার করতে-করতে

পাহাড়ে উঠছে।

কী হল কে জানে। ব্যাপারটা কী? কোন অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলেছে এরা?

আমি আর বাইরে না-থেকে গুহার ভেতরেই চলে গেলাম।

কিন্তু আওয়াজটা যেভাবে বাড়ছে তাতে তো মনে হচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা গুহার সমান্তরালে চলে আসবে। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়া মরে।" কিন্তু আমার গুহার দিকে কেন? ওরা কি আমার জন্যই আসছে নাকি? আমি তো কিছু করিনি ওদের!

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর ব্যাপার বেগতিক দেখে আমি ওইদিকের পাহাড়ের দিকে; মানে, যেদিকে গুলি খেয়েছিলাম, মানুষদের মেয়ে-দুটোকে যে অঞ্চলে ধরেছিলাম, সেইদিকেই এগিয়ে চললাম আড়াল নিয়ে-নিয়ে।ভীষণ অস্বস্তি লাগতে লাগলো আমার। আরে! মানুষকে যদি অন্য অবস্থাতে খেতেই চাইতাম তবে কি এতলোকে বেঁচে থাকতো আজ শোভাযাত্রা করে আসার জন্যে?

আমাদের পাহাড়টার নীচে নেমে ভাবলাম, ওই রাস্তার দিকে আর যাব না। তার চেয়ে খাদের ডান ধার দিয়ে চলে যাই আমাদের পুরোনো আস্তানার দিকে। মানে, সেই উপত্যকার নদীর মধ্যের অশ্বত্থ গাছের নিরাপত্তায়।

আস্তানা বদলাবার সময় বোধ হয় হয়েছে।

কিন্তু ডান দিকের খাদে যাব বলে কয়েক পা মাত্র এগিয়েছি অমনই গুড়ুম্ করে একটা গুলির শব্দ হল। দেখি,ডান দিকে খাদের পথ আটকে তিন-চারজন লোক গাছে-গাছে বসে আছে।

কী ব্যাপার! এমন কান্ড তো আজ অবধি দেখিনি। মাও কখনও দিনের বেলাতে মেন বিপদের কথা বলেনি আমাদের।গুলিটা করার রকম ও মানুষটার দূরত্ব দেখেই বুঝলাম যে, এটা আমাকে মারার জন্য করা নয়। যাতে ডান দিকে না যাই, তাই নিশ্চিত করার জন্য! এও তো আজিব ব্যাপার। ডান দিকে না গিয়ে, আমি বাঁ দিকের খাদ ধরে দৌড়লাম।

সেদিক থেকেও সঙ্গে সঙ্গে গুলি হল।

এদিকে টারা পাহাড়ের নীচ থেকে যারা আসছিল, তারাও প্রায় আমার পেছনে এসে পৌঁছেছে।

পরামর্শ করারও কেউ নেই আমাদের। সাহায্য চাইবারও কেউ নেই। বড় অভাগা আমরা। আমার মতো একটি অনভিজ্ঞ তরুণ বাঘকে মারবার জন্যে কী বিশাল মারণ-যজ্ঞ করেছে মানুষেরা। অথচ নিছক বেঁচে-থাকা ছাড়া আমার আর কোনো উচ্চাসা নেই। বাড়ি চাইনি, গাড়ি চাইনি, এমনকি একটি টি-ভিও চাইনি আমি! তবু মানুষেরা আমাকে মারতে চায়। হাসি এবং কান্না, দুইই একই সঙ্গে

পাচ্ছিলো আমার।

আমার মাথার মধ্যে রক্ত দপ্‌দপ্ করছিল। তবে, ভয় করছিল না। বাঘেদের কোষ্ঠীতে ভয় বলে কোনও শব্দ নেই। বাঘেদেরও ভয় করতে হতে পারে এমন ভয়াবহ কিছু এ-পৃথিবীতে যে আদৌ আছে এ কথাটা কোনো বুনো-বাঘ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

কখনও-কখনও অবশ্য আমাদের মতো জঘন্য জন্তু বাঘেরাও মানুষদের নীচতায়, খলতায়, অসততায় বোকা বনে যায়। তাদের বুক ভেঙে যায়। তবু ভয় আমাদের ছুঁতে পারে না।

কী করব, ভেবে না পেয়ে আমি বাধ্য হয়েই ওই পাহাড়েই চড়তে আরম্ভ করলাম। ভাবলাম, ওই যে পথের পাশে টিলা আর গুহা, ওখানেই গিয়ে আশ্রয় নেব।

এই ঠিক করে আমি দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছিলাম সব কষ্ট তখনকার মতো ভুলে গিয়ে।

এ দিকটাতে কোনও গোলমালও নেই। পাহাড়টা উঠে সেই সমান জায়গাটার আধাআধি এসেছি। দূরে, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে এখন সেই লাল মাটির পথটা দেখাও যাচ্ছে। দূরে, বাঁ দিকে, সেই টিলাটাও। শীতের দুপুরের শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল বন মিশ্র-গন্ধে ভরপুর হয়ে আছে। উত্তুরে হাওয়া মুচুর-মুচুর করে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে বয়ে যাচ্ছে স্বগতোক্তি করতে করতে।

সোজা টিলাটার দিকে না গিয়ে ভাবলাম, আগে পথটা তো পেরিয়ে নিই। ওই পথটা পেরুনোই সবচেয়ে বিপদের। টিলাটার দিকে নজর রেখে পথটার দিকে দ্রুতগতিতে কিন্তু সাবধানে এগোচ্ছি। পথটার প্রায় কাছাকাছি চলে গেছি, এমন সময়ে আমার সামনে পথের ওপাশ থেকে কী যেন গাছ থেকে ঠক্‌ঠক্ করে উঠল।

চমকে উঠলাম আমি। চমকে উঠে বাঁ দিকে সরে গিয়ে একটি ঝোপের আড়ালে বসে পড়লাম।

গাছে বসে ঠকঠক আওয়াজ করছিলো কিছু মানুষ। তাদের বলে "স্টপার"। মনে পড়লো, মা একদিন বলেছিলো বটে। আর যারা টারা নদী থেকে আমাকে তাড়া করে নিয়ে এল, তাদের বলে "বিটারস"। এই স্টপারেরা ওদের দিক দিয়ে পথ পেরোতে না-দিয়ে আমাকে রাস্তার এমনই একদিকে যেতে বাধ্য করছে যে, আমি যেন শিকারীদের ঠিক সামনে গিয়ে হাজির হই। যাতে তারা সহজেই আমাকে মারতে পারে। হাঃ। আমার মতো এক চারপেয়েকে মানুষেরা ওদের অভিমন্যুর মর্যাদা দিচ্ছে। হাঃ। এমন সময় আমার হঠাৎই মনে হল, মা যেন বলল, "খোকন, যাস না। ওদিকে যাস না।"

আমি ভাবলাম, মনের ভুল। তাছাড়া মাতো তার পুরুষ বন্ধুর জন্যে আমাদের

ছেড়ে গেছে। বুঝিয়ে দুটি কথা বলা পর্যন্ত প্রয়োজন মনে করেনি। আমার মাতো তেমন মা নয়।

থেমে যেতেই, পায়ের ব্যথাটা তীব্রতর হয়ে উঠল। এবং মানুষদের কারসাজি দেখে আমারও জেদ চেপে গেল। যে-শিকারী আমার পায়ের এই অবস্থা করেছে, তাকে আমি দেখতে চাই। তার বউকে খেয়েও আমার তৃপ্তি হয়নি। আমি তাকে আমার নখে-দাঁতে ছিন্নভিন্ন করতে চাই।

এক ঝট্‌কাতে উঠে আমি স্টপারদের নীচ দিয়ে এক দৌড়ে আর তিন লাফে পথটা পেরিয়ে গেলাম। দুটো গাছ থেকে একসঙ্গে গুলি হল শট্‌গানের গুলি। এল.জি। ঝরঝর করে পাতায়-ঝাড়িতে এল.জি-র দানা পড়ল। আমি বন্দুকের পাল্লার বাইরে ছিলাম। রাইফেলের গুলি হলে অন্য কথা হত। তা ছাড়া, গুলিও করেছিল তেমনই শিকারীরা। যাকে বলে "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।"

গুলি হতেই, স্টপারেরা হল্লাগুল্লা করে চেঁচিয়ে উঠল, "বাঘ লাইন ক্রস করে গেল। লাইন ক্রস করে গেল।"

ওরা ভাবল, আমি পথ পেরিয়ে পেছনের জঙ্গলের কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে গেছি। কিন্তু তা না করে, আমি পথ পেরিয়েই জঙ্গলের আড়ালে ওই টিলা আর পাথরগুলোর দিকেই এগোতে লাগলাম। এ-দিকে সূর্য অনেকক্ষণ হলো পশ্চিমে হেলে গেছে। শীতের বেলা। হয়তো ঘন্টাখানেক পরই সন্ধে নেমে যাবে।

কিছুটা এগিয়েই, সেই টিলাটা চোখে পড়ল।

লক্ষ করলাম যে, আমি যেখান থেকে লাফ দিয়ে কাল যে মেয়েটিকে ধরেছিলাম ঠিক সেই জায়গাটাতেই দু'জন শিকারী বন্দুক রাইফেল বাগিয়ে বসে পথের দিকে মুখ করে রয়েছে।

দাঁতে দাঁত কড়মড়িয়ে না-বলে বললাম, তোদের শিয়রে শমন। তোরা জানিস না তা।

ওরা কি স্টপারদের চিৎকার শোনেনি? কে জানে?

আমি যখন গুঁড়ি মেরে-মেরে ওদের পেছন দিয়ে এগোচ্ছি, পেছন দিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে ওদের ওই শক্ত পাথরেই ইঁদুরের মতো থাবার নীচে পিষে ফেলব এই মতলবে; তখন আবারও আমার ডান হাতের থাবাটার কথা মনে হল। দাঁড়িয়ে পড়ে, দম বন্ধ করে; চলবার সময়ে যে গোঙানি হয়, সেটা বন্ধ করার চেষ্টা করলাম। তারপরই খুব আস্তে-আস্তে এগোলাম ওদিকে ।

ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে গেছে।

রোদ; হঠাৎ ঠাণ্ডা। বহুরঙা ফুল-ফোটা বিচিত্র ল্যান্‌টানা বা পুটুস এর তীব্র-কটু গন্ধে শীতের শেষবেলা ভরে উঠেছে। আমি এখন শিকারীদের একেবারেই কাছে পৌঁছে গেছি। এখন একেবারে ওদের পেছনে। শুধু নিঃশব্দ পায়ে লাফিয়ে উঠব এবারে পাথরটাতে। ঠিক অমনই সময়ে ওদের মধ্যে একজন



হঠাৎ পিছন ফিরল। সঙ্গে-সঙ্গেই আমি মাটিতে শুয়ে অনড় হয়ে গেলাম। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে ফেলে 'ফ্রিজ' করে গেলাম।

লোকটা পেছনে ভাল করে তাকালও। কিন্তু পুটুসের আড়ালে অনড় আমাকে দেখতে পেল না। ওপরে বসে আমাকে দেখা কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না। নেমে এলে, বা কিছুটা নামলে তবেই দেখতে পেত আমাকে।

এবারে এক লাফে আমি পাথরের ওপরে উঠতেই টিলাটার উলটো দিকে পথের ওপাশের একটি গাছ থেকে একজন আদিবাসী-শিকারী চিৎকার করে করে উঠলঃ "বাবু! বাবু! আপনাদের পেছনেই বাঘ! পেছনেই বাঘ!

কিন্তু শহুরে শিকারীরা মুণ্ডু ঘোরাবার আগেই আমি এক লাফে পাথরে উঠে তাদের দু'জনকেই সত্যি-সত্যিই ইঁদুরের মতো চেপে ধরে দুই ঝট্‌কায় দু'জনের মাথা আর ঘাড় চিবিয়েই ছেড়ে দিলাম। ধড়-দুটি কিছুক্ষণ থর্‌থর্‌ করে কেঁপেই শান্ত হয়ে গেল।

তাদের একজনের রাইফেল হাত ফস্‌কে নীচে পড়তেই তা থেকে গুলি বেরিয়ে গেল, গদ্দাম করে। অন্যজনের রাইফেল তার মৃতদেহর পাশের পাথরে পড়ে রইল।

যেই আমি মাথা তুললাম ওদের ছেড়ে, সঙ্গে-সঙ্গেই উলটো দিক থেকে সেই আদিবাসী শিকারী আমাকে গুলি করল।

এতক্ষণ করেনি, পাছে তার মনিব শিকারীদের গায়ে লাগে তাই।

গুলিটা আমার মাথাটাকে চুরচুরই করে দিত কিন্তু মাথাটা পাথরের আড়ালে থাকায় পাথরের চল্‌টা উঠিয়ে দিয়ে বুলেটটা এসে আমার ডান কাঁধের কাছে লাগল।মনে হল, কাঁধটা ভেঙেই গেল।গুলিটা বুকের মধ্যেই ঢুকে যেত। পাথরটাই বাঁচাল। কিন্তু বন্দুকের বুলেট, কাছ থেকে মারা; কাঁধ আমার একেবারে চুরচুর করে দিল। কাছ থেকে বন্দুকের মার, রাইফেলের মারের থেকেও মারাত্মক হয়।

দ্রুত, আমি যেদিক থেকে এসেছিলাম, সেদিকে কোনওক্রমে গিয়ে পাথরের নীচেই ঘাঁটি গেড়ে বইলাম। বেশিদূর যাওয়ার উপায়ও আমার ছিল না। এদিকে অন্ধকারও হয়ে এসেছে।

শিকারী এই অন্ধকারে নিজের জীবন বিপন্ন করে কাছে আসবে না। তার কোনও তাড়াও নেই। কারণ, সে জানে তার গুলি আমার শরীরের কোথায় চোট করেছে। সে শহুরে, আনাড়ি শিকারী নয়। কাল দিনের বেলাই সে এবং আরও অনেকে ফিরে আসবে শালকাঠে বেঁধে আমার মৃতদেহ বাংলোয় নিয়ে যেতে। কোন শহুরে শিকারীর আলোকিত বসার ঘরের দেওয়ালে অনন্তকাল আমি ঝুলে থাকব তা কে জানে! যে-শিকারী আমাকে আসলে মারেনি, সে তার সুন্দরী শ্যালিকা আর শ্যালকের বউদের কাছে, আমাকে কী করে যে শিকার করল;

তারই রোমহর্ষক বর্ণনা দেবে।প্রচণ্ড বিপজ্জনক সব ঘটনার গা-শিরশিরানো বর্ণনা দিয়ে আর তখন অভুক্ত আদিবাসী **শিকারী** তার ঘরের সামনে আগুনের সামনে বসে, নাতি কোলে করে হুঁকো খাবে। আগুনের চটপট শব্দ আর হুঁকোর হুড়ুক-গুড়ুক শব্দ মিশে যাবে চারপাশের শীতার্ত অন্ধকারে।

তার নাতি বলবে,"নানা, গল্প বলো। বাঘ শিকারের গল্প বলো।"

বুড়ো বলবে, "বাঘ এল।গুলি করলাম।বাঘ মরল।"

সত্যিকারের যাঁরা বড় **শিকারী**, গল্প তাঁরা করতে জানেন না।

আদিবাসী **শিকারীর** ওপর আমার বড় অভিমান হল। জঙ্গল-পাহাড়ের সেও যেমন আদিবাসী, আমি, আমার পূর্বপুরুষরাও তো তাইই! আমাদের স্বার্থ, চাওয়া-পাওয়া সবই তো এক। আমাদের অনাবিল জগৎকে তো এই শহুরেরাই নষ্ট করে দিল। তাই এক আদিবাসীর কি উচিত অরণ্যের আদিমতম আদিবাসীকে অমন আড়াল থেকে মারা?

মৃত্যুর সঙ্গে শিশুকাল থেকেই আমি পাঞ্জা লড়েছি। যমরাজা তার নিজের আংটি আমাকে পরিয়ে দিয়েছিল। একটু আগে সেই আংটিই আমার আঙুল থেকে নিঃশব্দে খুলে নিয়ে সে নিজে হাতে পরেছে।

এবারে সে পাঞ্জা লড়বে আমারই সঙ্গে। হাঃ।

আত্মসমর্পণ?

না

সমর্পণ জানি না আমরা। একতিল প্রাণ যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণই লড়ে যাব। স্বাধীনতা অথবা প্রাণ বাঘেরা কোনও শর্তেই বিক্রি করে না। 'সন্ধি' বলেও কোনও শব্দ নেই বাঘেদের অভিধানে।

শব্দ শুনে বুঝলাম যে, **আদিবাসী শিকারী** সন্তর্পণে গাছ থেকে নামল। কিন্তু বুঝিনি যে, সে ওই টিলার বাঁ দিকের আর-একটি গাছে নিঃশব্দে উঠল। যে-গাছ থেকে আমাকে দেখা যাবে।

অবশ্য তাকে যদি উঠতে দেখতাম তাহলেও আমার কিছুই করার ছিল না। কারণ, আমার নড়াচড়ার জোর আর একটুও ছিল না। হু-হু করে রক্ত বেরোচ্ছিল কাঁধ থেকে। ভীষণ পিপাসাও পেয়েছিল আমার। ভাবছিলাম, এবারে, কাত হয়ে টিলার পাথরে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

ঠিক এমনই সময়ে পেছনে যেন কী শব্দ হল। অনেক কষ্টে ঘাড় ঘুরিয়েই দেখি যে, আদিবাসী **শিকারী** একটি কাঞ্চন ফুলের গাছে উঠে আমার শরীরের বাঁ দিকে তাক করেছে তার বন্দুক। শরীরের ডান দিকটা পাথরের দিকে ছিল। তাই সে দেখতে পাচ্ছিল না। সে চেয়েছিল, কানে বা ঘাড়ে মারতে।

তাকে ভয় পাওয়াবার জন্য প্রচণ্ড গর্জন করে ওখান থেকে একটু এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই তার গুলিটা এসে আমার ঠিক বাঁ কাঁধে লাগল। এল

জি-র সবক'টি দানা অত কাছ থেকে এসে আমার বাঁ কাঁধটিকেও ভেঙে দিল। তবুও শেষ-শক্তি জড়ো করে শরীর ঘুরিয়ে, যেন কিছুই হয়নি; এমনই ভাব করে হুঙ্কার দিয়ে আমি লাফ দিয়ে তার দৃষ্টির বাইরে শীতের অন্ধকার জঙ্গলের গভীরে সেঁধিয়ে গেলাম।

শেষবারের মতো লাফ দিলাম আমি।

শেষবারের মতো জঙ্গলের গভীরে সেঁধোলাম।

আদিবাসী শিকারী কিছুক্ষণ পর সাবধানে নেমে, চলে গেল। বোধ হয়, তার কাছে মাত্র দুটি গুলিই ছিল। হাতে বাবুদের বন্দুক, তাতে বাবুদের গুলি।

সেইশিকারীও আমারই মতো। ভয় ছিল না তার চরিত্রে। নইলে আমার গর্জনে সে গাছ থেকে পড়েই যেত। বানরদের মতো অনেক শিকারীই যায়। সেসব অধঃপতনের গল্প তারা কাউকেই বলে না। বা সাড়ম্বরে লেখে না, খবরের কাগজে। যা বলে, বা লেখে তা......।

সান্ত্বনা এইটুকুই রে, কাপুরুষের হাতে মরতে হল না।

অনেক মানুষের গলা শুনতে পেলাম। দূরে। কীসব কল্পনা-জল্পনা হচ্ছে। নিশ্চয়ই আমাকেই নিয়ে। কিন্তু আমি তো এখন সব জল্পনা-কল্পনার বাইরেই চলে যাচ্ছি। আস্তে-আস্তে, খুব আস্তে-আস্তে, নিজের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু থেকে আমি সরে যাচ্ছি। অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সব।

কপারস্মিথ পাখি ডাকছে একটা। পেছন থেকে। রাস্তার দু'পাশের জঙ্গল থেকে তার দোসর সাড়া দিচ্ছে।

কালো ঈগল ডানা ঝাড়া দিল শিমুলের মগড়াল থেকে।আর কোন কোলাহল নেই।ঝিঝিরা ডাকছে। শিশির পড়া শুরু হবে এক্ষুনি। সব বোধ আমার ভোঁতা হয়ে আসছে। কান আর শব্দগ্রহণ করবে না। শ্লথ হয়ে আসছে নিশ্বাস। শরীরের সব রক্তই বোধ হয় বেরিয়ে গেল। বড়ই দুর্বল লাগছে।

হঠাৎ দেখি শীতের বনে হলুদ থালার মতো চাঁদটা বিশ্বচরাচর উদ্ভাসিত করে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে উঠে আমার মুখে চেয়ে আছে অপলকে।

ওহে চাঁদ। শোনো, আমি এবারে যাব চাঁদ।

শেষ চেষ্টাতে, ডান হাতের থাবাটা শেষবারের মতো তুলে তাকে ডাকলাম, আয় চাঁদ, আয়। আয় আমরা খেলা করি। শিশুকালে যেমন খেলতাম।

চাঁদ কথা বলল না। চেয়ে রইল শুধু আমার চোখে।

এবারে আমি কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম।

বড় পিপাসা।

আমার পেটটা ওঠানামা করতে লাগল জোরে-জোরে।

দুটো পেঁচা ঝগড়া করতে-করতে জড়িয়ে-মড়িয়ে উড়ে-উড়ে ওপরে উঠতে লাগল। আসলে ওটাই ওদের ভাব।

আমার ভালবাসার বন। ভালবাসার পাহাড়, নদী, আমার পাখি, প্রজাপতি, হরিণ, চিতা, চিল; তোমরা শোনো, আমি চল যাচ্ছি। আবার আসব কোনোদিন। ফিরে আসবো এই সুন্দর দেশে। এই বনে, পাহাড়ে। আবার আসব বাঘ হয়ে। তোমরা সবাই আমার অপেক্ষাতে থেকো।

আমি না বলেও এত সব কথা বলতে চাইলাম।

আমার দু'ঠোঁটের কষ বেয়ে তখন রক্ত গড়াচ্ছিল।রাত গভীর হলো গভীরতর মাঝরাতে,একসময়ে আমি................

পুবে আলো ফুটতে-নাফুটতেই জিপে করে, ট্রাকে করে, বন্দুক রাইফেল,লাঠি-সোঁটা, বল্লম, তীর, ধনুক, শালের খুঁটি, দড়িদড়া নিয়ে যখন ওরা আসবে তার অনেকক্ষণ আগেই কোনও কাপুরুষ শিকারীকে আমাকে একটুও অবমাননা করতে না দিয়েই আমি ছোটর কাছে পৌছে গেছি।

বহু দূরে।

অন্য বনে।

ওদের বিজয়-বাজনা আমার কানে আদৌ বাজবে না

আয় চাঁদ, আয়! শেষবারের মতে আয়, একটু খেলাকরি। শিশুকালে গুহার সামনের পাথরে বসে যেমন খেলতাম।

আয়, চাঁদ আয়।